নিযামুদ্দিন মারকায ও নেপথ্যের কিছু সত্য

[প্রথম খণ্ড]

ভেতরে আরো রয়েছে,

মাওলানা ইবরাহিম দেউলা সাহেব ও
মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের চিঠি

সংকলন

মাওলানা আমানত উল্লাহ চৌধুরি

রুকন, কার্যনির্বাহী পরিষদ, মাদরাসায়ে কাশেফুল উলুম
বাংলেওয়ালি মসজিদ, হযরত নিযামুদ্দিন বস্তি, দিল্লি

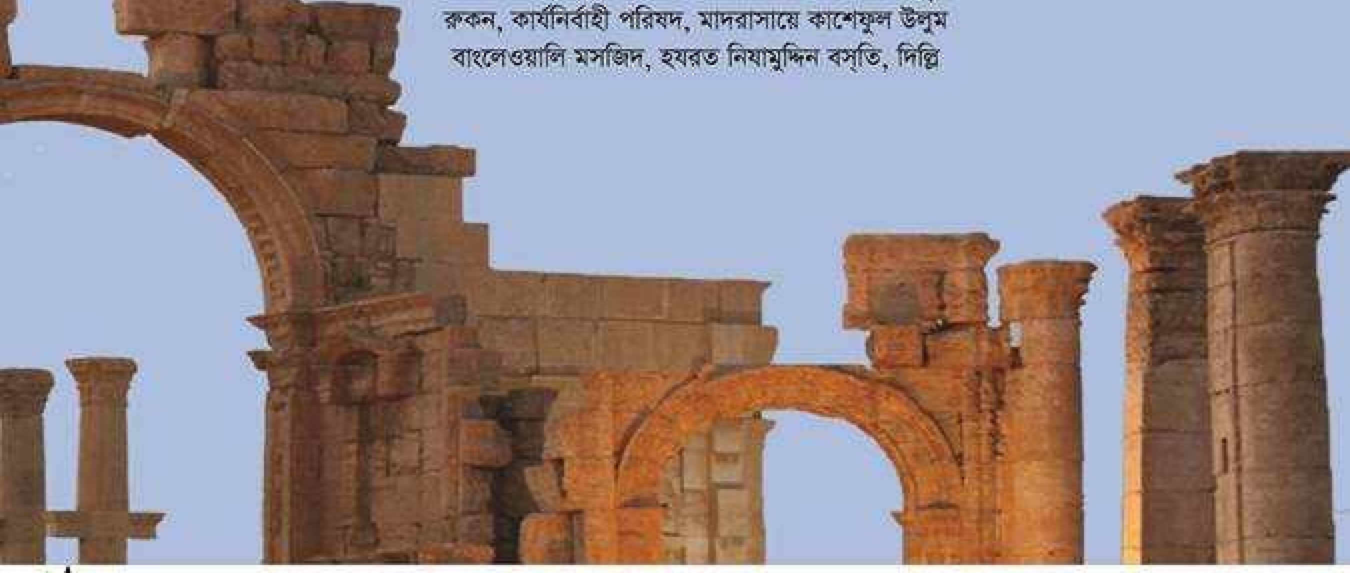

নিযামুদ্দিন মারকায
ও নেপথ্যের কিছু সত্য

নিযামুদ্দিন মারকায
ও নেপথ্যের কিছু সত্য

[প্রথম খণ্ড]

ভেতরে আরো রয়েছে,

মাওলানা ইবরাহিম দেউলা সাহেব ও
মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের চিঠি

সংকলন
মাওলানা আমানত উল্লাহ চৌধুরি
রুকন, কার্যনির্বাহী পরিষদ, মাদরাসায়ে কাশেফুল উলুম
বাংলেওয়ালি মসজিদ, হযরত নিযামুদ্দিন বস্তি, দিল্লি

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আসআদ

প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ২০১৭ ঈ.
যিলকদ ১৪৩৬ হি.

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আসআদের পক্ষে পাড়াগাও, আশুলিয়া, ঢাকা থেকে প্রকাশক আবদুল্লাহ আল ফারুক কর্তৃক প্রকাশিত ও মাকতাবাতুল আযহার দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস ১৯ প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
☎: 02 988 15 32
📱: 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার,
ঢাকা 📱 017 15 02 31 18

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি,
ঢাকা 📱: 019 75 02 31 18

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী, কালার ক্রিয়েশন
বর্ণবিন্যাস : মদীনা বর্ণশীলন, alfaruque1983@gmail.com

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

মূল্য : ৫০ [পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

MARKAJ NIZAMUDDIN
0 NEPOTTHER KICHU SOTTO
Published by : Maktabatul Azhar. Dhaka, Bangladesh
Published by : Maktabatul Azhar. Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 50.00 US $ 10.00 only.

সূচিপত্র

মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. এর মূল্যবান বাণী ৭
কিছু কথা কিছু নিবেদন ৯
প্রথম চিঠি ২৭
দ্বিতীয় চিঠি ৪০
মাওলানা ইবরাহিম দেউলা সাহেবের চিঠি ৪৪
রায়ভেন্ডের চিঠি ৪৯
মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের চিঠি ৫১
তাবলিগের সাথী ভাইদের কাছে একান্ত অনুরোধ ৫৭
ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অমীয় বাণী ৫৯
দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া [চয়িতাংশ] ৬১

মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. এর মূল্যবান বাণী

আমার পদমর্যাদা একজন সাধারণ ঈমানদার থেকে উঁচু মনে করা যাবে না। শুধু আমার কথার ওপর আমল করা বদদ্বীনি হবে। আমার কথাগুলো কুরআন-সুন্নাহর মানদণ্ডে বিচার করবেন এবং নিজে চিন্তা-ভাবনা করে আমল করবেন। আমি তো শুধু পরামর্শ দিই।

আপনাদের সবার এই হরকত-মেহনত, সমস্ত চেষ্টা-সাধনা নিষ্ফল হয়ে যাবে যদি এর সঙ্গে ইলমে দ্বীন ও আল্লাহর যিকিরের প্রতি আপনারা পূর্ণ গুরুত্ব ও মনোযোগ নিবদ্ধ না করেন। যদি এ দুটি বিষয়ের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করা হয় তাহলে একটি ভয়াবহ ও মারাত্মক বিপদের তীব্র শঙ্কা বোধ করছি। আল্লাহ না করুন, তখন এই হরকত ও সাধনা শেষপর্যন্ত ফিতনা ও গুমরাহির একটি নতুন দরোজার রূপ নিতে পারে।

যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের রাত সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর রাতের সদৃশ্য হয়ে পুরোপুরি মিলে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সারা দিনের হরকত-মেহনত সার্থক হবে না। কারো ব্যক্তিসত্তা বা কারো বাণী যদি এতোটা প্রিয় হয়ে ওঠে যে, তার ব্যক্তিসত্তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিকল্প, আর তার বাণী আল্লাহর বাণীর বিকল্প মনে হয় তাহলে আমার মতে এটিও ধর্মদ্রোহ।

তাবলীগের এই কাজে ভুল (অর্থাৎ নীতি অমান্য করা) খুব দ্রুত ধ্বংস বয়ে আনবে।

সদাচরণের মাধ্যমে, আমিত্ববিলোপের মাধ্যমে তাবলীগ করবে। শাসকের ভাষায় কথা বলবেন না; বরং মাশওয়ারা প্রদানের আঙ্গিকে কথা বলবেন।

কিছু কথা কিছু নিবেদন

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

বাংলেওয়ালি মসজিদ বসতি হযরত নিযামুদ্দিন রহ.-এ অবস্থিত তাবলিগি মারকায আসলেই দারুল ইসলামের জীবন্ত-জাগ্রত উদাহরণ ছিলো। এখান থেকে পরিচালিত দাওয়াত ও তাবলীগের অদ্বিতীয় মেহনত সমগ্র পৃথিবীতে উম্মাহর সবধরনের শ্রেণির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিলো। যাদের অন্তরে উম্মাহর জন্যে দরদ ছিলো, এই মেহনতের বদৌলতে তাদের অন্তরে নতুন করে আশা জাগতে শুরু করে যে, এই বুঝি ইসলামের পুনর্জাগরণ ঘনিয়ে আসছে। এখানকার আলো-বাতাসে ছড়িয়ে ছিলো নিঃস্বার্থ সেবা, আল্লাহভীতি, নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দান, সহমর্মিতা ও আল্লাহর পতাকা উচ্চকিত করার সুদৃঢ় বাসনা। এমন আলোকময় পরিবেশে যে ব্যক্তি অল্প সময় হলেও অতিবাহিত করেছেন, ওই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোনোদিন ঘৃণাক্ষরেও এ কল্পনা করেননি যে, এখানকার আলো-বাতাস একসময় আমূল বদলে যাবে। এমন দুর্দিন নেমে আসবে যে, প্রতিদিন ঝগড়া-হাতাহাতি হবে, একজন অপরজনকে নিয়ে কুধারণা করবে, পরস্পরে চক্রান্ত হবে। এমনকি প্রকাশ্যে-সবার চোখের সামনে এমনভাবে মাস্তানগিরি ঘটবে যে, জামাতের দীর্ঘদিনের মুখলিস সদস্য ও আকাবির— যারা এই মেহনতের জন্যে নিজেদের পুরো জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন, তারাও এই মারকাযকে 'বিদায়' জানাতে বাধ্য হবেন।

যারা এখানকার হাল-হাকিকত সম্পর্কে কিছুটা হলেও অবগত, তারা জানেন যে, হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. (মহান আল্লাহ তাঁকে

সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করুন) ইনতিকালের পূর্বে খুলাফায়ে রাশেদিনের উত্তম আদর্শ অনুসরণ করে নিজ সাহেবযাদা মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ.-কে 'আমীর' না বানিয়ে একটি 'আলমি শুরা' বানিয়ে দিয়েছিলেন। এই শুরার মাঝে তিন রাষ্ট্রের দশজন যিম্মাদার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাজের ব্যাপকতা এবং কাজে সম্পৃক্ত অধিকাংশ রাষ্ট্রে বসবাসকারী নানা শ্রেণি, নানা মানসিকতার ও নানা মতাদর্শের সদস্যদের দিকে লক্ষ্য রেখে তখন এ সিদ্ধান্তকেই সঙ্গত মনে করা হয়েছিলো যে, এই মহান দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করার জন্যে প্রয়োজন একাধিক পরীক্ষিত ব্যক্তিত্বের এমন একটি জামাত– যাঁরা পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সার্বিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পথপ্রদর্শন করবেন। অথচ মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. নিজেও একজন উঁচু মানের হাফেয ও আস্থাভাজন আলেম ছিলেন। তিনি যেমন শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. এর কাছ থেকে তাযকিয়ায়ে বাতিনের ইজাযত পেয়েছেন, তেমনই নিজ আব্বাজান রহ. এর কাছ থেকেও ইজাযত পেয়েছেন। এর পাশাপাশি দাওয়াত ও তাবলীগের এই মেহনতের সবগুলো ক্ষেত্র সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। কেননা প্রায় ২৫ বছর ধরে তিনি তাঁর আব্বাজানের সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে দেশে-বিদেশে অসংখ্য-অজস্র সফর করেছেন ও মেহনতের সার্বিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৯৫ সালের জুন মাসে হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর ইনতিকালের পর এই 'আলমি শুরা' নিযামুদ্দিন মারকাযের জন্যে পাঁচ সদস্য (মাওলানা ইযহারুল হাসান সাহেব, মাওলানা মুহাম্মদ উমর পালনপুরি সাহেব, মিয়াঁজি মেহরাব সাহেব, মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব ও সাহেবযাদা মুহাম্মদ সা'দ সাল্লামাহু) বিশিষ্ট একটি 'শুরা মজলিস' নির্ধারণ করে দেয়। শুরার সদস্যগণ পালাক্রমে 'ফয়সাল' — 'সিদ্ধান্তদাতা' হতেন। যদিও এই সিদ্ধান্তের ওপর মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেবের সমর্থকগণ তীব্র অসন্তোষও প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু মাওলানা নিজে কখনই আমির মনোনীত না হওয়ার ওপর কোথাও কোনো অভিযোগ তুলেননি; এমনকি কখনো অসন্তোষও প্রকাশ করেননি। বড়দের শুরা যেই ব্যবস্থাপনা চূড়ান্ত করে দিয়েছে, তা মেনেই নিজের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এই পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট শুরার মাঝে সাহেবযাদা মুহাম্মদ সা'দ সাল্লামাহুকেও (তখন তাঁর বয়স আনুমানিক ত্রিশ বছর) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। অথচ তিনি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ইলমি সনদ অর্জন করেননি। কোনো বুযুর্গের সঙ্গে ইসলাহি সম্পর্ক কায়েম করেননি। কোনো জামাতেও সময় দেননি। এমনকি যিম্মাদার মনোনীত হওয়ার পরও জামাতের সঙ্গে সময় লাগানো আবশ্যক মনে করেননি। অথচ এ কথা সবাই স্বীকার করবে যে, 'আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যাবতীয় উসুল মেনে সময় না লাগালে এ কাজের মা'রিফাত অর্জিত হয় না।' এতদসত্ত্বেও শুরার সদস্য মনোনীত হওয়ার পর তিনি এ আব্দার শুরু করে দেন যে, 'তাকে যেন বিভিন্ন ইজতিমা ও অন্যান্য অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দুআ করা ও সবার সঙ্গে মুসাফাহা করারও সুযোগ দেওয়া হয়।'

অথচ তাঁর এই আব্দার এই মেহনতের মেজাযের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খায় না। কেননা এই তাবলীগে সময় অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দান (ঈসার) ও বিনয় (কাসরে নাফসি) শিক্ষা দেওয়া হয়। দুআ তো সত্ত্বাগতভাবে নিজেই এমন এক আমল, যার প্রেক্ষিতে দুআপ্রার্থনাকারীর ভেতর অবশ্যই নিজেকে তুচ্ছ মনে করা, নিজেকে অক্ষম মনে করা ও বিনম্রতার গুণ থাকতে হবে। জানি না, যিম্মাদারগণদের দৃষ্টিকে কী এমন মাসলাহাত (কর্মকৌশল) বা বাধ্যবাধকতা ছিলো যে, সেদিকে তাকিয়ে তারা এই বিপদজনক আব্দার মেনে নিয়েছিলেন এবং দুআ ও মুসাফাহার আমলটিকে মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব ও সাহেবযাদা সাদ সাল্লামাহুর মাঝখানে আধাআধি করে বণ্টন করে দেন। পরবর্তীকালে এই সমস্যাই পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে মাওলানা ইযহারুল হাসান সাহেব ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ছিলেন মসজিদের ইমাম, মাদরাসার শায়খুল হাদিস ও মারকাযের নাযিম (পরিচালক)। তাঁর ইনতিকালের পর সাহেবযাদা সা'দ সাল্লামাহু-কে মারকাযের নাযিম বানানো হয়। তিনি সবগুলো দায়িত্ব নিজের হস্তগত করার পাশাপাশি মারকাযের কোষাগারও হাতের মুঠোয় নিয়ে নেন। অথচ ইতোপূর্বে সবসময় মারকাযের কোষাগারের যিম্মাদারি ও নাযিমের দায়িত্ব ভিন্ন দু' ব্যক্তি পালন করতেন। সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হলো, মারকায সম্পর্কিত আয়-ব্যয়ের নিয়মমাফিক কোনো হিসাব-নিকাশ এখন আর তৈরি হয় না। এমনকি মজলিসে আমেলার সামনেও কোনো বিবরণী উপস্থাপন করা হয় না।

এর কিছু দিন পর সাহেবযাদা সা'দ সাল্লামাহু এ প্রয়োজন পেশ করেন যে, তিনি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. এর কিতাবাদি দেখতে চান। এ কথা বলে তিনি হযরতের পুরনো কামরার চাবি নিয়ে নেন। কেননা এ কামরাটি অধিকাংশ সময় তালাবদ্ধ থাকতো। শুধু সকালে পরামর্শের সময় খোলা হতো। এই হুজরার দ্বিতীয় ছাদের রুমে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. এর কুতুবখানা ছিলো। এরপর তিনি ধীরে ধীরে সেখানে বৈঠক-জমায়েত শুরু করে দেন। এক পর্যায়ে কামরাটি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। অথচ পূর্ব থেকেই নতুন বিল্ডিংয়ে তার জন্যে একটি কামরা বরাদ্দ ছিলো। এটাই সেই কামরা— যেটিকে হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর জীবদ্দশায় বাংলেওয়ালি মসজিদের সম্প্রসারণের সময় মসজিদে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছিলো। কিন্তু সাহেবযাদা সাদ সাহেব কয়েকজন মেওয়াতি ও বসতি নিযামুদ্দিনের কয়েকজন নওজোয়ানের মাধ্যমে মারকাযের ভেতর হাঙ্গামা বাধিয়ে এই সিদ্ধান্ত স্থগিত করিয়ে দিয়েছিলেন।

এর কিছু দিন পর আরেকটি ঘটনা ঘটে। মারকাযের হযরতদের আবাসিক ভবনের একটি অংশ— যা মসজিদ ও উপর্যুক্ত কামরার সঙ্গে লাগোয়া আছে এবং যেখানে মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব দীর্ঘ দিন সপরিবারে বসবাস করে আসছিলেন। সেই অংশের ওপর সাহেবযাদা সাদ সাহেব দাবী তুলে বসেন যে, এই অংশ তাকে দিতে হবে। অথচ তিনি সপরিবারে সেই ভবনের দক্ষিণ দিকের অংশে বসবাস করে আসছেন। সাহেবযাদা সাদ সাহেব বিষয়টিকে আশ-পাশের যিম্মাদারদের কাছেও টেনে নিয়ে যান। তাঁরা বিষয়টিকে পরিবারের বড়দের হাওয়ালা করে দেন। ফলশ্রুতিতে কোনো ধরনের বৈধতা না থাকা সত্ত্বেও মাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ.কে ওই অংশ ছেড়ে দিতে হয়।

হযরতজি রহ. ইনতিকাল করেছিলেন **১৯৯৫** সালের জুন মাসে। এর চৌদ্দ মাস পর হযরত মাওলানা ইযহারুল হাসান সাহেব রহ. **১৯৯৬** সালের আগস্ট মাসে ইনতিকাল করেন। এর নয় মাস পর হযরত মাওলানা উমর পালনপুরি রহ. **১৯৯৭** সালের মে মাসে ইনতিকাল করেন। এর সোয়া বছর পর মিয়াঁজি মেহরাব সাহেব **১৯৯৮** সালের আগস্ট মাসে অস্থায়ী জগত ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান। এই তিন হযরত ছিলেন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের অনন্য পদমর্যাদার অধিকারী মনীষী। তাঁরা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগ সম্পর্কিত নিজ নিজ দায়িত্বাবলি নিষ্ঠার সঙ্গে আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন। (মহান আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে, উম্মাহর সকল সদস্যের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে যথোপযুক্ত বিনিময় দান করুন। আমীন।)

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মারকাযের পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট শুরা তিন বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতর মাত্র দু' সদস্যে নেমে আসে; কিন্তু সেই শূন্যস্থানগুলো পূরণ করা হয়নি। মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব যখন বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তখন সাহেবযাদা সাল্লামাহু এ কথা বলে নাকচ করে দেন যে, 'সবাই তোমার ও আমার কারণে এখানে জমায়েত হয়। কাজেই কাউকে বিনাকারণে গুরুত্ব দেওয়ার কী দরকার! তার এ উত্তরে মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব চুপ হয়ে যান। কেননা এ সময়ের ভেতর এমন অনেকগুলো বিষয় ঘটেছে (যার কয়েকটির কথা আমি উপরে উল্লেখ করেছি) যেগুলোর কারণে তিনি বিবাদে যেতে চাচ্ছিলেন না। উদ্দেশ্য হলো, কোনোভাবেই যেন এই মহান মেহনত বিশৃঙ্খলার শিকার না হয়।

শূরার সদস্যপদ পূরণ না হওয়ার কারণে আরেকটি ক্ষতি হয়েছে। তাহলো এর মাধ্যমে মারকাযের প্রথম সারির যিম্মাদারদেরকে পরোক্ষভাবে এ বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, কান্ধলা পরিবারের সদস্যরাই এই মহান মেহনতের আসল উত্তরাধিকারী। অন্য সবার পদমর্যাদা হলো, তারা এ কাজের সহায়ক মাত্র। কাজেই তারা যেন নিজ সীমারেখা অতিক্রম না করে। এর পাশাপাশি সাহেবযাদা সাল্লামাহু মারকাযের সবগুলো শাখার ওপর নিজের

নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে বেশকিছু খুবই অসঙ্গত কৌশলের প্রয়োগ শুরু করে দেন। উদাহরণস্বরূপ,

১. সাহেবযাদা উঠতে-বসতে সবসময় এ কথা বলা শুরু করতেন যে, পেছনের ত্রিশ বছরে (অর্থাৎ হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেবের যুগে) দাওয়াতের কাজকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে। এই মারকায খানকাহে পরিণত হয়েছে। তখন কয়েকজন হীতাকাঙ্ক্ষী তাঁকে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, 'নিজের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের কাজকর্মের ভুল বের করা রাজনীতিকদের পদ্ধতি। দ্বীনদারদের পদ্ধতি হলো, নিজের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের সবগুলো প্রয়াসের প্রশংসা করা এবং নিজেকে তাঁদের অনুগ্রহধন্য স্বীকার করা। কিন্তু সাহেবযাদা সাল্লামাহু কখনই এ পরামর্শে কর্ণপাত করেননি।

২. যেই নিযামুদ্দিনে এতোদিন 'ইকরামুল মুসলিমীন' এর দীক্ষা দেওয়া হতো এখন সেখানে ছোট-খাট বিষয় নিয়ে সবার সামনে এমন ব্যক্তিদেরকেও বকা-ঝকা ও হুমকি-ধমকি দেওয়া শুরু হয়ে যায়, যারা বয়স ও মর্যাদা দু'ভাবেই সাহেবযাদা থেকে বড়। এটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

৩. 'জ্বি, হুজুর' যারা বলতে পারে, কেবল তাদেরকেই যিম্মাদারি দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকেই মাশওয়ারায় শামিল করা হচ্ছে। তাদেরকেই বয়ান করা ও সফরের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এর বিপরীতে যারা তার আবিস্কৃত-নব উদ্ভাবিত বিষয়গুলোর সঙ্গে মতভেদ করতো, তাদেরকে যাবতীয় কর্মকাণ্ডে শুধু উপেক্ষাই করা হচ্ছে না; বরং তাদেরকে প্রকাশ্যে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। এক্ষেত্রে আঙুল তোলার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না।

এই কাজগুলো করে প্রথমে ময়দান নিজের পক্ষে মসৃণ করা হয়। এরপর শুরু হয় ইসলাহ (সংস্কার) ও তাজদীদ (নবায়ন) এর ধারাবাহিক পদক্ষেপ। যারা ধারাক্রম শুরু হয় নামায থেকে। এই মসজিদের এই জায়নামাযে তার পরদাদা, দাদা ও পিতা; এমনকি নানাদের মতো ব্যক্তিবর্গ যে পদ্ধতিতে নামায নিজে পড়েছেন, অন্যদের পড়িয়েছেন, এখান সেখানে বড় দাগে পরিবর্তন করেন এভাবে যে, কওমা ও জলসার মাঝে সেই

মাসনুন দুআগুলো পড়া শুরু করে দেন, যা হানাফি মাযহাব অনুসারে ফরয নামাযে নয়; শুধু নফল নামাযে পড়া যাবে। এমন পরিবর্তনে গোটা জামাত বিস্মিত হয়; কিন্তু কেউ 'উফ' বলার সাহস পায়নি। একজন এ ব্যাপারে কারণ জানতে চাইলে উত্তর আসে, 'আমি মুহাম্মাদি। আমি সুন্নাহ অনুসরণ করি।'

এরপর দাওয়াত ও তাবলীগের এই মুবারক মেহনতের পুরো নকশাই বদলে ফেলা হয়। যেই মাকামি মেহনত 'দাওয়াত, তালীম ও ইসতিকবালের' মাধ্যমে সম্পন্ন হতো, এখন সেটা সংকুচিত হয়ে এ পর্যায়ে নেমে আসে যে, মসজিদের চারপাশে যাদেরকে অবসর পাওয়া যাবে, তাদেরকে ধরে মসজিদে নিয়ে আসবে এবং তাদেরকে দাওয়াতে তালীমে বসিয়ে দেবে। এই এক কাজকেই মসজিদ আবাদ করার মাধ্যম অভিহিত করা হচ্ছে। এমন সিদ্ধান্তের কারণে প্রথম যে ক্ষতিটি হয়েছে, তাহলো, এর ফলে মেহনতের সাথীদের মন থেকে ব্যক্তিগত মা'মুলাতের প্রতি গুরুত্ববোধ সম্পূর্ণ রূপে নিঃশেষ হয়ে যায়। এরচেয়েও বড় ক্ষতি হলো, পূর্বে আড়াই ঘণ্টাওয়ালি যেই তরতিব অবলম্বন করা হতো, যার বদৌলতে সাথীরা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা অনুসারে নিজেদের ঘরে গিয়ে, বা কর্মস্থলে গিয়ে অন্য ভাইদেরকে দ্বীনের ওপর চলার কারণে দুনিয়া ও আখেরাতে কী লাভ পাওয়া যায়, আর দ্বীনের ওপর না চলার কারণে কি কি ক্ষতি হয়, সে কথা বোঝাতে পারতেন। আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার কী প্রয়োজনীয়তা, সে কথাও বোঝাতে পারতেন। নতুন নিয়মে এর সমুদয় নিঃশেষ হয়ে যায়।

আরেকটি ইসলাহি কাজ হলো, ফাযায়েলের কিতাবসমূহের তালীম বাদ দিয়ে মুনতাখাব হাদীসকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অথচ কোনো শুরাই কখনো এ কিতাবকে জামাতের সিদ্ধান্তকৃত নিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেনি। উপরন্তু এ কিতাবটিকে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. এর 'চয়ন-নির্বাচন' বলা হচ্ছে। অথচ বাস্তবতা হলো, হযরতওয়ালার লেখা এ বইয়ের হস্তলিপির পাণ্ডুলিপি (কলমি মুসাওয়াদাহ) আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। কারণ, মাওলানা ইউসুফ রহ. এমন কোনো আনুষ্ঠানিক 'চয়ন-নির্বাচন' কখনই করেননি। তিনি কোনোদিন কারো সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনাও করেননি।

সাহেবযাদা সাল্লামাহু নিজেকে তাবলীগি ঘরানার মাঝে পরিচিত ও বিখ্যাত করে তোলার মাধ্যম হিসেবেই এ পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং নিজেকে এ গ্রন্থের লেখক হিসেবে জাহির করতে চেয়েছেন। অথচ প্রতিবেশী দেশের একদল উলামায়ে কেরাম 'মুনতাখাব হাদিস' প্রণয়ন করেছেন। সাহেবযাদা সাল্লামাহু এই 'কল্যাণকর' কাজ এতোটাই গোপনীয়তার সঙ্গে নিষ্পন্ন করেছেন যে, সেখানকার যিম্মাদারদেরকেও সংবাদ পেতে দেননি। শুধু এ কারণেই আজ পর্যন্ত সেই হযরতগণ কিতাবটিকে জামাতে তাবলীগের তালীমি নিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রস্তুত নন। ওই অঞ্চলেও এ কিতাব জামাতের তালীমে পড়ানো হয় না।

আরেকটি বড়-সড় পরিবর্তনের কথা বলছি। সবসময় জামাতের মাঝে এ উসূল ছিলো যে, ছোট-বড় প্রত্যেকেই নিজ আলোচনা ছয় নম্বরের সীমারেখার ভেতর সীমিত রাখবে। সমকালীন পরিবেশ, মতাদর্শিক মতবিরোধ, ফিকহি মাসাইল, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ছিদ্রান্বেষণ ও অপর পক্ষকে প্রতিহত করা– এমন আলোচনা নিজের বয়ানের মাঝে তুলবে না। যারা দ্বীনি ইলম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অর্জন করেননি তাদের জন্যে নিজ বয়ানের মাঝে কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করার অনুমতি নেই। তারা শুধু ভাষ্য বয়ান করতে পারবেন। আর উলামা হযরাত যখন কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন তখন শুধু আকাবির-আসলাফের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত তাফসির-তাশরিহ বলতে পারবেন। কিন্তু সাহেবযাদা সাল্লামাহু এই সুন্দর উসুলগুলোকে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি এমন এমন কথা বলেন, যা সুস্পষ্টভাবে কয়েকজন নবী ও কয়েকজন সাহাবির শানে ঔদ্ধত্যের নামান্তর। কথাগুলো তার মুখ থেকে যারা শুনেছেন তাদের অধিকাংশজন যেহেতু ইলমে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ, এজন্যে তারা যখন সেই কথাগুলো নিজেদের এলাকাতে বলা শুরু করেন তখন স্থানীয় মসজিদগুলোর ইমাম সাহেব ও অপরাপর উলামায়ে কেরাম পড়ে যান দ্বিমুখী সংকটে। যদি ভুল কথাগুলো ধরতে যান তাহলে 'তাবলীগবিরোধী' তকমা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে হৈ-হুল্লোড়, চিৎকার, গালি-গালাজ শুরু হয়ে যায়। আর যদি শুনেও চুপ থাকেন তখন হয়ে পড়েন 'নাহি আনিল মুনকার' বা 'অন্যায় দেখেও বারণ' না করার গুনাহগার।

শুধু এতোটুকুই নয়; সাহেবযাদা সাল্লামাহু এরচেয়েও বড় দুঃসাহস দেখিয়েছেন বাইআতের ক্ষেত্রে। হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর ইনতিকালের পর শুরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, বাংলেওয়ালি মসজিদে বর্তমানে বাইআত মওকুফ থাকবে। শুরার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাহেবযাদা সাল্লামাহু অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। কেননা ওই সময় মারকাযে একমাত্র মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেবই ছিলেন একক ব্যক্তি, যার হাতে মানুষের বাইআত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। কেননা তিনি হযরত শাইখুল হাদীস ও হযরতজি রহ. এর ইজাযতপ্রাপ্ত খলিফা ছিলেন। তাঁর দরবারে প্রতিদিন যিকিরের আসরও বসতো। ওই যুগে সাহেবযাদা সাল্লামাহু এ কথা বলে বেড়াতেন যে, তাবলীগের সাথীদের জন্যে কোনো শায়খের কাছে বাইআত হওয়াটা শুধু অপ্রয়োজনীয়-ই নয়; ক্ষতিকরও বটে। কিন্তুমাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ. এর ইনতিকালের পর থেকে সাহেবযাদা সাল্লামাহু বিদেশ সফরে বাইআত শুরু করে দেন। এর মাধ্যমে যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, বাইআত এমনই এক মোক্ষম হাতিয়ার যে, এর মাধ্যমে সহজেই লোকদেরকে নিজের একান্ত বাধ্য-অনুগত বানানো যায় তখন তিনি মারকাযের ভেতরেই এতোটা ধুমধামের সঙ্গে প্রতিদিন বাদ মাগরিব সবার বাইআত নেওয়া শুরু করে দেন যে, তার হুজরার বাইরে আগত জনতার ভীড় লেগে যেতো। কারণ, সারাদিন তার পক্ষ থেকে কিছু লোক মারকাযে আগত জনতাকে বাইআত গ্রহণের জন্যে তাশকিল করে তৈরি করে রাখতো। বাইআতের কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাংলেওয়ালি মসজিদে বিভিন্ন ভাষার হালকাগুলো শব্দহীন খামুশ থাকে। এই বাইআতের ক্ষেত্রেও সাহেবযাদা সাল্লামাহু নিজের একক ইজতিহাদের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি বাইআত গ্রহণকারীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের সময় এ কথা বলান,

بیعت کی میں مولانے . امحمد الیاس ر حمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر سعد کے واسطے سے

‘বাইআত হচ্ছি আমি মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. এর হাতে সাদের মাধ্যমে।’

বাইআতের শব্দগুলো লক্ষ্য করে দেখুন, এখানে তিনি আপন দাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. এর কথা স্মরণ করছেন না, অথচ নিজের

বয়ানে অধিকাংশ সময় হাওয়ালাগুলো এমনভাবে দেন যে, মনে হবে, হযরতওয়ালার কথা তিনি নিজেই শুনেছেন। উলামায়ে কেরাম বলেন, কেউ যদি কোনো বুযুর্গের কাছ থেকে ইজাযত না পাওয়া সত্ত্বেও সেই বুযুর্গের নাম নিয়ে বাইআত করায় তাহলে তার এ কাজ সুলুকের লাইনে অনেক বড় খিয়ানত-অবিশ্বস্ততা বিবেচিত হবে। আর এ কথা সবাই জানেন যে, সাহেবযাদা সাল্লামাহু যেমন হযরতওয়ালা রহ. এর যুগ পাননি, তেমনই হযরত রহ. এর কোনো খলিফার কাছ থেকে বাই‘আতের ইজাযতও পাননি।

যেমনটি উপরে বলা হয়েছে যে, দুআ ও মুসাফাহার মাঝে পারস্পরিক অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতা সাহেবযাদা সাল্লামাহুর দাবী ও আব্দারের পরিপ্রেক্ষিতে জারি হয়েছিলো। সবসময় এ বিষয়টি নিয়েই দূরত্ব সৃষ্টি হতো। ২০১৪ সনের মার্চ মাসে যখন মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব ইনতিকাল করেন তখন মরহুমের সমর্থকগণের দাবি ছিলো, তাঁর স্থানে তাঁর ছেলে মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেবকে দুআ ও মুসাফাহার পুরনো দস্তুর অনুসারে শরিক করা হোক। কিন্তু সাহেবযাদা সাল্লামাহু এ কথা মঞ্জুর করেননি। যার ফলে দুআ ও মুসাফাহার বিষয়টি নিয়ে ছোট-খাট বিবাদ চলে আসছিলো। এই বিবাদ প্রকাশ্যে বিস্ফোরিত হয় ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে ভুপালে অনুষ্ঠিত ইজতিমার সমাপনী অনুষ্ঠানে। যখন মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেবের সাথীরা তাকে মুসাফাহার জন্যে স্টেজে এনে বসিয়ে দেন তখন সাহেবযাদা সাল্লামাহু অসন্তুষ্ট হয়ে স্টেজ ছেড়ে চলে যান। ওই সময় তিনি তার সমর্থকদেরকে এমনভাবে উত্তেজিত করে তুলেন যে, গোটা মেওয়াতে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। এক ডজনেরও অধিক স্থানে বংশীয় পঞ্চায়েত ও সালিশি বৈঠক বসে। হাজার হাজার মানুষ সেখানে সমবেত হয়। স্থানীয় আলেমরা ও মাতব্বররা বারুদমাখা ভাষণ দেয়। যেমন, ‘আমাদের আমির মাওলানা সাদ সাহেব। তাঁর পরে তাঁর সন্তানই আমাদের আমির হবেন, নাবালেগ হলেও।’ ‘আমরা অন্য কাউকে আমির হিসেবে মেনে নেবো না।’ ‘আমরা মেওয়াতিরাই মারকাযের যিম্মাদারির দায়িত্ব পালন করবো। অন্য এলাকা ও অন্য দেশের লোকদেরকে দায়িত্ব পালন করতে দেবো না।’

কয়েকজন দায়িত্বশীল উপস্থিত লোকদের অবহিত করে যে, ‘মাওলানা সা‘দ সাহেব তাদের বলেছেন,

رمضاں لسے ۔ یک جتنی تکلیف پہنچائی ہے، میں تو بتا نہیں سکتا میرا مار ۔ ا
باقی ہے.

‘রমাযান থেকে এ পর্যন্ত তাকে যে পরিমাণ কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। শুধু আমার হাত তোলা বাকি আছে।’

এ কথা বলে মাওলানা সাদ সাহেব প্রথম তার এক খাদেমের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, যেই খাদেম কয়েক বছর পূর্বে তার খেদমতে অবস্থান করতে পরিষ্কার অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এরপরও সে মারকাযে থাকতো। মাওলানার দস্তরখানে খাবার খেতো। প্রতিদিনের মাশওয়ারায় শরিক হতো; অথচ তিনি তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারতেন না। দ্বিতীয় আরেকজনের দিকেও ইঙ্গিত করেছিলেন, যে প্রথমে হযরতজি রহ. এর খেদমতে থাকতেন। এরপর মাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ. এর খেদমতে থেকেছেন। এখন মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেবের সঙ্গে থাকছেন। ভুপাল ইজতিমার সমাপনী দুআর সময় তিনিই মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেবকে মুসাফাহার জন্যে স্টেজে এনে বসিয়েছিলেন। এঁদের দু’জনই মৌলভি এবং মেওয়াতের অধিবাসী।

এর পরিপ্রেক্ষিতে উপর্যুক্ত পঞ্চায়েতগুলোর বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, তাদের দু’জনকে তাৎক্ষণিকভাবে মারকায ছেড়ে দিতে হবে। অন্যথায় মেওয়াতিরা তাদেরকে মারকায থেকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসবে এবং তাদেরকে টুকরো টুকরো করবে।

পঞ্চায়েতের বৈঠকগুলো সমাপ্ত হওয়ার পর উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত নিজ হাতে বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা নিয়ে মেওয়াতিদের একটি অংশ সদলবলে মারকাযের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। যেহেতু সেই পঞ্চায়েতগুলোর সমাবেশে প্রকাশ্যে চরম উত্তেজনাকর বক্তব্য দেওয়া হয়েছিলো এবং আক্রমণাত্মক সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিলো, তার সংবাদ পেয়ে হরিয়ানা পুলিশ তাৎক্ষণিক

সতর্ক হয়ে যায়। তারা মেওয়াতিদের তৎপরতার যাবতীয় সংবাদ ও মারকাযের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার তথ্য দিল্লি পুলিশকে অবহিত করে। দিল্লি পুলিশ সতর্ক পদক্ষেপ হিসেবে মারকাযের চতুর্দিকে নিজেদের ফোর্স মোতায়েন করে। পুলিশির গতিবিধি লক্ষ্য করে সেই দলটির চৌকস দায়িত্বশীলরা কোনো ধরনের অঘটন না ঘটিয়েই নিজেদের সদস্যদের নিয়ে ফিরে যায়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে সেদিন নিযামুদ্দিন মারকায বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা লাভ করে।

এরপর ২০১৫ সালের আগস্ট মাসের ১৮ তারিখে মারকাযের উপরতলায় ইউপি তাবলীগের জোড় অনুষ্ঠিত হয়। সেই জোড়ের সমাপনী দিনে মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেবকে দিয়ে যেন মুসাফাহা না করানো হয়, এ দাবী নিয়ে সাহেবযাদা সাল্লামাহু্র অনুগত সমর্থকরা প্রচণ্ড শোরগোল, ধাক্কাধাকি ও হাতাহাতি বাধিয়ে দেয়। এই লজ্জাস্কর ঘটনার সংবাদ পুরো নগরীতে ছড়িয়ে পড়ে। চারপাশে চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। ২০ আগস্ট বৃহস্পতিবার মারকাযের মাঝেই দিল্লির যিম্মাদারগণদের পরস্পরে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। ২৩ আগস্ট বসতি নিযামুদ্দিনে অবস্থানকারী কিছু সাথী —এই মেহনতের সঙ্গে যাদের পুরনো সম্পর্ক— তারা দুঃখজনক পরিস্থিতির ওপর নিজেদের আফসোস প্রকাশ করতে এবং এর সমাধান বের করার আবেদন নিয়ে মারকাযের যিম্মাদারদের সামনে মাশওয়ারার সময় উপস্থিত হন। তাদের একজন যখন এ বিষয়ে কথা বলা শুরু করেন তখন সাহেবযাদা সাল্লামাহু তৎক্ষণাৎ ধমকি দিয়ে বলে উঠেন—

بغیر اجازت آگئے، اور بلاوجہ مداخلت کرتے ہیں، چپ رہیں.

‘অনুমতি না নিয়েই চলে এসেছো! এবং অকারণে নাক গলাচ্ছো! চুপ থাকো।’

এ নিয়ে যখন পুনরায় উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায় তখন সাহেবযাদা সাল্লামাহু বলে উঠেন—

میں امیر ہوں، ھدا کی قسم میں پوری امب کا امیر ہوں.

‘আমি আমির। আল্লাহর কসম, আমি পুরো উম্মাহর আমির।’

উত্তরে একজন বলে বসে—

آپ کو امیر کس نے بنایا ہے؟

'কে আপনাকে আমির বানিয়েছে?'

তখন তিনি চুপ হয়ে যান। ওই সময় একজন বলে উঠেন—

ہم آپ کو امیر نہیں مانتے.

'আমরা আপনাকে আমির মানি না।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফোস করে মন্তব্য করেন—

تم سب جاو جہنم میں.

'তোমরা সবাই জাহান্নামে যাও।'

এ উত্তর পেয়ে তারা উঠে চলে যান।

যখন পরিস্থিতির আশু উত্তরণের কোনো পথ দেখা যাচ্ছিলো না তখন তাদের মধ্য হতে কিছু সদস্য প্রতিবেশী দেশে অনুষ্ঠিতব্য ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে সেখানকার যিম্মাদারদেরকে পতনোন্মুখ পরিস্থিতির লাগাম টেনে ধরার ব্যাপারে উদ্যোগী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সেমতে নভেম্বর ২০১৫ সালের ইজতিমায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের যিম্মাদারদের সামনে পুরো পরিস্থিতি মেলে ধরেন। সেই বৈঠকে সার্বিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর বানিয়ে দেওয়া শুরা পুনর্গঠন করা হবে। (যার দশ সদস্যের মধ্য হতে আট সদস্য ইতোমধ্যে ইনতিকাল করেছেন।) এর ফলে নিযামুদ্দিন মারকাযের পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট শুরা পূর্ণতা পেতে শুধু একটি পদ শূন্য থাকবে। সাহেবযাদা সাল্লামাহু উভয় প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তিনি নিযামুদ্দিন মারকাযের শুরার ব্যাপারে বলেন যে, সেখানে শুরা বিদ্যমান রয়েছে। যখন তার কাছে শুরার বিবরণ তলব করা হয় তখন বলেন, এখন গিয়ে বানিয়ে নেবো।

ওই মজলিসেই যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, 'আপনি পুরো উম্মাহর আমির হওয়ার দাবী করেছেন' তখন প্রথমে পরিষ্কার অস্বীকার করেন।

যখন তাকে বলা হয় যে, সেই বক্তব্যের অডিও রেকর্ড হাতে রয়েছে তখন তিনি বলেন, 'যখন কিছু লোক আমার ওপর চড়ে বসবে আর মাশওয়ারার মাঝে হট্টগোল বাঁধাবে তখন কি আমি কিছু বলতে পারব না?'

সাহেবযাদা সাল্লামাহুর এই দ্বিমুখী অবস্থান অর্থাৎ প্রথমে একটি কথার পরিষ্কার অস্বীকার, আর এরপর সেটি মেনে নেওয়া– এ বিষয়টি উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তখন তারা তার ভিন্ন অবস্থান উপেক্ষা করে আলমি শুরার জন্যে এগার সদস্য বিশিষ্ট এবং মারকাযে নিযামুদ্দিনের শুরার জন্যে পাঁচজনের নাম চূড়ান্ত করে তার ওপর লিখিত স্বাক্ষর করে জানিয়ে দেন।

সাহেবযাদা সাল্লামাহু তখন বেদনাহত হয়ে, ভাঙা মনে দিল্লি ফিরে আসেন। দ্বিতীয় দিনেই নিজের সমর্থকদের দিল্লিতে ডেকে এনে তাদের উদ্দেশে কয়েকটি নির্দেশনা জানিয়ে দেন। যেমন, 'ওখানে কোনো শুরা গঠিত হয়নি। ওখানে আমাকে অপমান করা হয়েছে। আর এ কাজে দিল্লির কয়েকজন সদস্যও জড়িত ছিলো। আপনাদের দায়িত্ব হলো, আপনি তাদেরকে ও তাদের সমমনাদেরকে বয়কট করবেন।'

শুধু এতোটুকুই নয়, তিনি নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে নির্দেশ করেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মারকাযে আসা ঠিক হবে না।' তার এ সিদ্ধান্তে তাবলীগের ইতিহাসে এবারই সর্বপ্রথম হরতাল পালিত হয়। তার অনুসারী কর্মীরা মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে, সবগুলো মসজিদ প্রদক্ষিণ করে সেখানকার লোকদেরকে মারকাযে আসতে বারণ করে এবং কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে তাদের বিরুদ্ধে খুবই উত্তেজনাকর বক্তব্য প্রদান করে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে। যার ফলে নভেম্বরের শেষ দিকের ও ডিসেম্বরের শুরুর দিকের বৃহস্পতিবারগুলোতে শহরের মেহনতি সাথীদের বড় একটি অংশ মারকাযে আসেনি।

তাজ্জবের বিষয় হলো, প্রথমে তো তিনি শুরা গঠনের বিরুদ্ধে শক্তভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং এ সিদ্ধান্ত ঠুকরে দিয়েছিলেন। কিন্তু এর পর এক মাস না যেতেই ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সেই শুরার পাঁচ সদস্যের সঙ্গে আরো চারজন সদস্যের নাম যুক্ত করে একটি চিঠি সেই যিম্মাদারদের খেদমতে প্রেরণ করেন, যাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান

করে তিনি মারকাযে ফিরে এসেছিলেন। ওই যিম্মাদার হযরতগণ এই অতিরিক্ত সংযোজনকে অসঙ্গত ও অপ্রয়োজনীয় অভিহিত করে পূর্বের সিদ্ধান্তের পুনরুক্তি করে জানিয়ে দেন যে, পূর্বের গঠিত শুরার অধীনেই তাবলীগের মেহনত চলমান থাকবে। শুরার সদস্যগণ পালাবদল করে ফয়সাল তথা সিদ্ধান্তদাতার দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু এবারো তিনি সেই সিদ্ধান্ত তোয়াক্কা করলেন না। অথচ পাঁচ সদস্যের প্রত্যেকেই মারকাযে সার্বক্ষণিক অবস্থান করছেন।

ওদিকে দিল্লি নগরীতে তাবলীগের সার্বিক কর্মকাণ্ড এতোটাই মুখ থুবড়ে পড়েছিলো যে, কোনো কিছুই আসল অবস্থার ওপর ছিলো না। নগরীটির মেহনতের যিম্মাদারকে সবধরনের ভর্ৎসনার টার্গেট বানানো হয়। এর পাশাপাশি অন্য যিম্মাদার সাথী— যিনি একাগ্রতার সঙ্গে দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছিলেন, তিনি এই পারস্পরিক টানাপড়েনের শিকার হয়ে পড়েন। সাহেবযাদা সাল্লামাহুর কিছু অনুগত আস্থাভাজন লোক নেতার আসনে চেপে বসে। বছরের পর বছর ধরে যেই মসজিদে শহরের মাসিক মাশওয়ারা হতো, নতুন নেতারা সেই পরামর্শ রহিত করে দেয়। যার ফলে এখন দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত স্রেফ নামকাওয়াস্তে জোড়ার কার্যক্রমে পরিণত হয়ে পড়ে। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যে সমস্ত সমস্যার দায়ভার হযরত মাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ. এর ছেলে মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেবের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বলা হয় যে, তাঁর নেতৃত্বের লোভ ও তাঁর অনুগতদের অশুভ তৎপরতার কারণে পরিস্থিতির বিপর্যয় ঘটেছে। অথচ এটি আদ্যোপান্ত মিথ্যা ও মারাত্মক অপবাদ। কেননা মাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ. যেমন কখনো আমির পদ লাভের দাবী তোলেননি; অথচ তিনি এর যোগ্য ছিলেন। তিনি তো বিগত ঊনিশ বছর ধরে নিজের চেয়ে ছোট ব্যক্তির অনুগত হয়েই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তেমনি তার ছেলে যুহাইরুল হাসানও কখনো এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেননি।

এখন পরিস্থিতি এতোটাই খারাপ হয়ে গেছে যে, এই মেহনতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বৃহদাংশের মন থেকে আল্লাহর ভয় উঠে গেছে। তারা

অবলীলায় মিথ্যা কথা ছড়াচ্ছে। গীবত তাদের মুখে খুবই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এই অপরিনামদর্শীদের মাধ্যমে নিজেকে আমির দাবীকারী একজন ব্যক্তি আবেগী ও ইলমশূন্য যুবকদের এমন একটি ইউনিট গড়ে তুলেছে, যারা কারো কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। তারা শুধু তথাকথিত আমিরের জন্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়াকেই নিজের মেরাজ মনে করে। দিল্লি লাগোয়া যমুনার ওপারের এলাকা ও মেওয়াত থেকে এমন কিছু মানুষকে দু'-দু' মাসের তাশকিল করে মারকাযে নিয়ে আসা হচ্ছে, যাদের একমাত্র কাজ, মারকাযের নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্ব পালন করা। মারকাযের বিভিন্ন স্থানে এদেরকেই প্রহরায় নিয়োজিত করা হয়। অনুমান করা হয়, প্রতিদিন এমন শখানেক লোককে দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের কারণেই মারকাযে কয়েকবার মারপিট ও ধাক্কা-ধাক্কির মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনাও ঘটেছে। গত রমাযান মাসে মারকাযে গুন্ডাগিরির সবচেয়ে লজ্জাস্কর ঘটনা ঘটে। সেদিন ইফতারের পর মারকাযের সবগুলো গেইট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর প্রতিপক্ষের লোকদেরকে একজন করে ধরে এনে বেধড়ক পেটানো হয়। পনেরো-বিশ জন গুন্ডা মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেবের কামরার ঠিক সামনের হলে হাতে লাঠি ও হকিস্টিক নিয়ে মারমুখী অবস্থান নেয়। এরপর তার দরোজার ওপর লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করে।

এদের একদল চলে যায় নতুন বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায়। সেখানে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব ও মাওলানা ইবরাহিম দেউলা সাহেবের কামরা অবস্থিত। তারা এ দু' কামরার তালা ভেঙে ভেতরের জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে। আরেকটি কামরায়ও লুণ্ঠন চলে। ওই কামরাটি মাওলানা আহমদ লাট সাহেবের মেহমানদের জন্যে ব্যবহৃত হতো। এমন ভীতিকর পরিস্থিতির কারণে মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেব নিজের বাসভবন থেকে বেরিয়ে তারাবীর নামাযে কুরআন শরীফ শুনানোর জন্যে মসজিদে কুরাইশেও যেতে পারেননি। তাঁর ঘরের সদস্যরা সারা রাত প্রচণ্ড ভয় ও উদ্বেগ সহকারে অতিবাহিত করেন। এমনকি সাহরির ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয়নি।

এমন প্রকাশ্য বর্বরতার সংবাদ মাওলানা আহমদ লাট সাহেব জানতে পেরে পরদিনই মারকায ছেড়ে নিজের মাতৃভূমিতে চলে যান। সাহেবযাদা

সাল্লামাহু সেই দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ তো নেননি; উপরন্তু তিনি বসতি নিযামুদ্দিনে বসবাসরত কয়েকজন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে বসেন।

মূলত এই অপারেশন পরিচালিত হয়েছিলো ওই দুই মেওয়াতি মৌলভিকে মারকায থেকে বের করে দেওয়ার জন্যে (যাদের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।) যারা নিজেদের জীবনের সিংহভাগ অংশ মারকাযে অবস্থান করে হযরাত বুযুর্গানে দ্বীনের খেদমতে থেকে কাটিয়ে দিয়েছেন। তারা দু'জন কোনোমতে নিজেদের জীবন বাঁচিয়ে মারকায থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন; কিন্তু আল্লাহ মালুম, কোন শত্রুর পরামর্শ শুনে ওই রাতে মারকাযে সেই ন্যাক্কারজনক অপারেশন ঘটানো হয়, যার কারণে বিশ্ববাসীর মন থেকে এই নিযামুদ্দিন মারকাযের অবশিষ্ট সম্মানটুকুও আজ মাটির সঙ্গে মিশে গেলো।

১.

এই ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে মেহনতের প্রথম সারির সাথী– যারা এই মহান কাজে সারা জীবন লেগে থেকেছিলেন– তাদের ধৈর্যের বাঁধ নড়বড়ে হয়ে গেছে। তাঁরা তো প্রথম থেকেই সাহেবযাদা সাল্লামাহুর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড দেখে মনোক্ষুন্ন ছিলেন এবং নীরবে-সংগোপনে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে আসছিলেন। তারা পরস্পরে একত্র হয়ে জনাবকে চিঠি লিখেও জানিয়েছেন। কয়েকবার সমবেত হয়ে নিজেদের বিভিন্ন খেয়াল ও আশঙ্কার কথা জনাবকে জানিয়ে সতর্ক করার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু জনাব তাঁদের সেই কথা ও পরামর্শ হাসি মেরে উড়িয়ে দিতেন। তাদেরই একটি চিঠির অনুলিপি —যা ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ এ লেখা— এ বইয়ের মধ্যবর্তী অংশে তুলে ধরা হবে।

২.

রমাযানুল মুবারকে ঘটিত মারধরের ঘটনাটি তাদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর পানি ঢেলে দিয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬ এর জুলাই মাসে মারকাযে সারা দেশের ত্রয় মাসিক জোড়ে অংশগ্রহণ করতে

তারা অপারগতা জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা ওই সময় যেই চিঠি লিখেছিলেন, তার ৪০ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ৪২ নম্বর পৃষ্ঠার লেখাগুলো পড়ে দেখুন।

৩.

অপরাপর সঙ্গীদের মারকায থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেখেও মাওলানা ইবরাহিম দেউলা সাহেব পরিস্থিতির আশু উত্তরণের আশায় নিয়মিত মারকাযের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু শেষতক তিনিও মারকাযকে বিদায় জানাতে বাধ্য হন। তার ২৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে লেখা চিঠির ৪৪ থেকে ৪৮ নম্বর পৃষ্ঠার লেখাগুলো পড়ে দেখুন।

৪.

দাওয়াত ও তাবলীগের এই আন্তর্জাতিক মেহনতের মাঝে আমাদের প্রতিবেশী দেশটিও নিয়মিত অংশগ্রহণ করে এসেছে; এমনকি আন্তর্জাতিক ময়দানে তাদের অবদান সবার চেয়ে অগ্রগণ্য। সাহেবযাদা সাল্লামাহুর এই আচরণ ও মারকাযের পরিস্থিতির কারণে তারা এতোটাই মনোক্ষুণ্ন হয়েছেন যে, এ বছর হজের সময় তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পবিত্র হিজায ভূমিতে তাদের কাফেলা মারকাযের কাফেলা থেকে আলাদা অবস্থান করে হাজিদের মাঝে মেহনত করবে। ২৩ জুলাই ২০১৬ তারিখে লেখা তাদের চিঠির ৪৯ নম্বর পৃষ্ঠা পড়ে দেখুন।

৫.

পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে যিনি দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সঙ্গে তনু-মন সহকারে জড়িত ছিলেন, মাদরাসায়ে কাশিফুল উলুমের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব —যার শিষ্যদের তালিকায় রয়েছেন আলোচিত সাহেবযাদা সাল্লামাহু ও তার পিতা মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ হারুন সাহেব— সেই মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব ২৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে নিজের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন। সেই চিঠির ৫১ নং পৃষ্ঠা থেকে ৫৫ নং পৃষ্ঠা পড়ে দেখুন।

নমুনা হিসেবে কয়েকটি চিঠি পেশ করা হলো। নয়তো চিঠি-পত্রের বিশাল স্তুপ রয়েছে। যেখানে উলামায়ে কেরাম ও আহলে হক দাঈ ভাইয়েরা এই উঁচু মেহনতের ওপর আপতিত পরীক্ষা ও বালা-মুসিবতের ওপর নিজেদের মনোকষ্ট ব্যক্ত করেছেন। কাজেই যেসব ভাই এ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের আবশ্যিক দায়িত্ব হলো, তারা যেন সচেতনতার সঙ্গে কাজ করেন এবং এই উঁচু কাজের হিফাযতের জন্যে যদ্দূর সম্ভব চেষ্টা ও মেহনত করেন। বিশেষতঃ গুরুত্বের সঙ্গে দুআ করেন।

নিবেদন্তে

গুনাহগার আমানত উল্লাহ
সদস্য, মজলিসে আমেলা, মাদরাসায়ে কাশেফুল উলুম,
বাংলেওয়ালি মসজিদ, বসতিয়ে হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া রহ. নয়া দিল্লি
মোবাইল : 91-8826297141
ফোন : 011- 22029832
ই-মেইল : inam_ur_rehman2003@yahoo.com
তারিখ : ১ অক্টোবর ২০১৬

প্রথম চিঠি

শ্রদ্ধেয় মাওলানা সা'দ সাহেব,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহ।

আশা করি, ভালো আছেন।

গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে লেখা চিঠিতে কয়েকটি কথা নিবেদন করা হয়েছিলো। কিন্তু এরপরও আপনার কর্মকাণ্ড এবং তাবলীগের মেহনতি সাথীদের সঙ্গে আপনার আচরণ বদলায়নি। এজন্যে মূল বিষয়গুলোতে পৌঁছুতে এবং ভুল বুঝাবুঝি থেকে উত্তরণ পেতে কয়েকটি কথা লিখিত আকারে পেশ করছি।

১.

এবারের ত্রয়মাসিক মাশওয়ারায় আপনি বলেছিলেন,

جو لوگ نہج کے بدلنے کی بات کر رہے ہیں وہ شیطانی وساوس میں مبتلا ہیں.

> 'যারা পথ-পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা বলছে তারা শয়তানি কুমন্ত্রণায় ফেঁসে আছে।'

অথচ এটাই বাস্তব যে, আপনার হাত ধরেই পথ-পদ্ধতি বদলাচ্ছে। পূর্বে আমাদের পদ্ধতি ছিলো, উম্মতের প্রতিটি সদস্যের কাছে যাওয়া। তাকে যেখানেই পাওয়া যাক। মসজিদে হোক বা প্লেনে হোক, ট্রেনে হোক বা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে হোক, ঘরে হোক বা ক্ষেতে হোক, ক্যারামঘরে হোক বা মদশালায় হোক, উম্মাহর কোনো সদস্যকে যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই তার কাছে গিয়ে তার মন তৈরি করে, তাকে আখেরাতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে, দাওয়াতের যিম্মাদারি বুঝিয়ে চার মাস থেকে শুরু করে মাকামি কোনো কাজে নবীওয়ালা মেহনতের জন্যে তৈরি করা। যখন সে

তৈরি হবে তখন তাকে যেকোনো উপায়ে মসজিদে নিয়ে আসা। কারণ হলো, আমাদের পুরো কাজ মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মেহনতের এই রুখ-গতিমুখ শুরু থেকেই চলে আসছিলো। যার শুভ পরিণতিতে উম্মাহর লাখো সদস্য ও ঘরানা দ্বীন ও দ্বীনের মেহনতের ওপর উঠে এসেছে। হাজারো নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে। বন্ধ মসজিদগুলো খুলে গেছে। সংকীর্ণ মসজিদগুলো এখন প্রশস্ত হয়েছে। অনাবাদ মসজিদগুলো নববী আমলগুলো দিয়ে আবাদ হচ্ছে। যার বরকতে এই মেহনত ও মেহনতের সাথীদের দিনদিন উন্নতি হচ্ছিলো। সার্বিক মেহনতের মাঝে দিন-রাত প্রবৃদ্ধি ঘটছিলো।

এরপর হযরতজি রহ. ইনতিকাল করেন। কাজের যিম্মাদারি পরবর্তীদের ওপর চলে আসে। সেই যিম্মাদারির অধীনে অসংখ্য বড় বড় মজমায়, অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে আপনি বয়ান করে আসছেন।

অল্প কদিনের মধ্যেই দেখা গেলো, আপনার সেই বয়ানগুলোর মাঝে কাজের নতুন রুখ আসতে শুরু করেছে এভাবে যে, 'আল্লাহর সম্পর্কের ভিত্তিতে মিলিত হওয়ার স্থান শুধু মসজিদ। আমাদের যাবতীয় গাশত মানুষকে মসজিদে নিয়ে আসার জন্যে। এক সাহাবি অন্য সাহাবির ওপর গাশত করে তাদেরকে মসজিদে ঈমানের মজলিসে জুড়তেন। সাহাবায়ে কেরামের মুজাহাদার এটাই একক তরিকা। এর বাইরে যতো তরিকা আছে সেগুলো হলো প্রচলিত সাংগঠনিক পদ্ধতি। সেগুলো কখনই মুজাহাদা নয়। সেগুলো সুন্নাহ পরিপন্থী। সীরাত থেকে প্রমাণিত নয়। এই তরিকাগুলো অবলম্বন করলে হয়তো রেওয়াজ-প্রথার প্রসার ঘটবে; কিন্তু কখনই দ্বীনের প্রসার ঘটবে না।'

এ কথাগুলোকে প্রমাণিত করার জন্যে আপনি সাহাবির ওপর সাহাবির গাশতের কথা বলেছেন; অথচ এটি সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার পরিপন্থী। আমাদের গাশত হলো, আল্লাহর যেই বান্দাদের মাঝে দ্বীনের তলব নেই, তাদের মাঝে নিঃস্বার্থভাবে মেহনত করা। এখন যদি ওই বান্দাদের মাঝে কুফরির কারণে দ্বীনের তলব না থাকে তাহলে তাকে দেওয়া হচ্ছে ঈমানের দাওয়াত। আর যদি ঈমানি দুর্বলতার কারণে দ্বীনের

তলব না থাকে তাহলে তাকে দেওয়া হচ্ছে ঈমান শক্তিশালী করার দাওয়াত। সাহাবায়ে কেরামের শান এগুলো থেকে অনেক উর্ধ্বে।

দ্বিতীয়ত আপনি আপনার এই নযরিয়া প্রমাণিত করার জন্যে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদি. মুআয ইবনে জাবাল রাদি. উমর ইবনুল খত্তাব রাদি. ও হযরত আবু হুরায়রা রাদি. প্রমুখে বিভিন্ন ঘটনা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। অথচ এই সবগুলো ঘটনার মধ্য হতে কোনো ঘটনায় মসজিদের 'কয়দ'-বা 'শর্ত' নেই হযরত আবু হুরায়রা রাদি. এর ঘটনা ব্যতিরেকে। আবু হুরায়রা রাদি. এর ঘটনায় মসজিদের উল্লেখ মাত্র একবারই এসেছে এবং সেখানেও শুধু মসজিদে আমল হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে, মসজিদে আনা হয়নি। এবং মসজিদে ইসতিকবালের কোনো সুরতও ছিলো না।

এ সব ঘটনা থেকে শুধু এতোটুকুই প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম যখনই একে অপরের সঙ্গে দেখা হতো, ঈমানের মুযাকারা করতেন। ঈমানের মজলিসের মাধ্যমে ঈমান বাড়ে। এর বাইরে যতোগুলো কথা রয়েছে সেগুলো ভিত্তিহীন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ আবাদ করেছেন দাওয়াত, ইবাদত, তালীম ও খিদমাতের মাধ্যমে। সাহাবায়ে কেরাম গাশত ছাড়াই সুযোগ-সুবিধা, প্রয়োজন ও নিজ সক্ষমতা অনুসারে সেই কাজগুলোতে অংশগ্রহণ করতেন। এই কাজগুলোর মাধ্যমেই মসজিদ অধিকাংশ সময় আবাদ থাকতো। এখন যদি আপনি বলেন, দাওয়াত, তালীম ও ইসতিকবাল-ই মসজিদে নববীওয়ালা কাজ; আপনি যদি এ দাবী তুলেন, যেই মসজিদে দাওয়াত, তালীম ও ইসতিকবাল নেই সেই মসজিদ মসজিদে নববীর মানহাজের ওপর নেই, তাহলে এটি আপনার অর্থহীন দুঃসাহস ও আপনার নিজস্ব ইজতিহাদ বিবেচিত হবে।

এই নতুন রুখের ওপর তাবলীগি মেহনতকে পরিচালিত করার জন্যে পুরো শক্তি ব্যয় করা হচ্ছে। যেসব লোক একমাত্র বয়ান করাকেই মূল কাজ মনে করে তারা দেশের ভেতরে-বাইরে এর ওপর পুরো শক্তি ব্যয় করছে। এমনকি জামাতগুলোকেও এ কাজের মাঝে এমভাবে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে

যে, মসজিদে তিন-চার দিন অবস্থান করে দাওয়াত, তালীম ও ইসতিকবাল করানো হচ্ছে। জামাত বাইরে বেরোচ্ছে, কি বেরোচ্ছে না— তা নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই। মারকাযে নিযামুদ্দিনেও কাজ বোঝার ও কাজের ফিকির নিয়ে যেই মজলিসগুলো হতো, সেগুলোও এখন নতুন রুখের আড়ালে ধ্বংস হয়ে গেছে। যার আবশ্যিক পরিণতিতে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটি হয়েছে তা হলো, পুরো মজমা কাজের যেই রুখের ওপর ছিলো, তা হয়তো ধ্বংস হয়ে গেছে, অথবা দুর্বল হয়ে পড়েছে। মসজিদ আবাদির নামে এখন সবাই মসজিদে বসে পড়েছে। মেহনতের পরিধি স্বল্প পরিসরে সীমিত হয়ে পড়েছে। যার মারাত্মক প্রভাব কাজের ওপরও পড়েছে, কাজকারী (দাঈদের) ওপরও পড়েছে। এর কারণে আসল মেহনত খতম হয়ে গেছে। যেই পরিকল্পনা আপনার মস্তিষ্কে ছিলো, সেটারও বাস্তবায়ন হয়নি। এখন এদিক-ওদিক দুকুলই হারাতে হচ্ছে। যারা কাজের ময়দানে আছেন, তারা পরিস্থিতির বিপর্যয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

নতুন রুখে কাজ করার ফলে কী ফলাফল হচ্ছে, এর কারগুজারি কী? এ সম্পর্কে কিছু সাথী আপনাকে খুশি করার জন্যে বলছে যে, খুব ফায়দা হচ্ছে। আসলে কিছুই হচ্ছে না। তারা অবাস্তব কথা বলছে। সৌজন্য দেখাতে তারা অতিরঞ্জন করে বলছে।

আমি আমার চিঠির সঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদি. এর একটি বর্ণনা জুড়ে দিচ্ছি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদি. প্রতি বৃহস্পতিবার জনগণের সামনে ওয়ায করতেন। একবার তাকে প্রতিদিন ওয়ায করার অনুরোধ জানানো হলে উত্তরে তিনি বলেন, প্রতিদিন ওয়ায করার মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে আরো বিরক্তিতে ফেলতে চাই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আমাদের বিরক্তি ও মনোভাবে সংকুচনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে আমাদের তত্ত্বাবধান ও হিফাযত করতেন, আমিও সেভাবে করছি। এর থেকে বুঝে আসে, 'প্রতিদিনের এই দাওয়াত, তালীম, ইসতিকবাল' আপনার নিজস্ব ইজতিহাদ। এটি সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের মানহাজের পরিপন্থী। আমাদের বুযুর্গগণ সপ্তাহে দু'বার গাশতের কথা বলতেন। এক গাশত নিজ

মহল্লায়। অন্য গাশত অপর মহল্লায়। এই তরতিবই সুন্নতসমর্থিত ও সাহাবায়ে কেরামের মানহাজ সম্মত। এখন সপ্তাহে দু গাশতের পরিবর্তে প্রতিদিনই একই মহল্লায় একাধিকবার গাশত হচ্ছে। যার ফলে মহল্লাবাসীদের মাঝে বিরক্তি, মানসিকতার সংকুচন ও এড়িয়ে যাওয়ার মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। আপনি কারগুজারি নেওয়ার সময় প্রশ্ন করেন,

روزانہ کتنی شفٹوں میں یہ عمل مسجد میں ہو رہا ہے؟

'প্রতিদিন কতগুলো শিফটে এই আমল মসজিদে পালিত হচ্ছে'?

আপনার এ কাজ আমাদের আকাবিরদের পথ ও পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

২.

দ্বিতীয় বিষয় মুনতাখাব হাদিস কিতাব সম্পর্কে। যখন কিতাবটির পাণ্ডুলিপি হাতে আসে তখন দরকার ছিলো কিতাবটি প্রকাশের ব্যাপারে সাথী-সঙ্গীদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া। কিন্তু এমনটি হয়নি। কোনো ধরনের পরামর্শ না করেই ছাপানো হয়েছে। ছেপে আসার পর তালীমের নিসাবে ঢুকানোর জন্যে মাশওয়ার সুরতে চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোনো কারণে মাশওয়ারা কামিয়াব হয়নি। এমতবস্থায় করণীয় ছিলো, অপেক্ষা করা, ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করা। কারণ, আল্লাহর ইলম অনুযায়ী কোনো কাজ যদি হক হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় সুন্দরভাবে কাজটি সম্পন্ন করে দেন। কিন্তু এমনটি করেননি। বরং মনের ক্ষোভে আপনি মাজমার মাঝেই মুতালাআ (অধ্যয়ন) এর মাধ্যমে কিতাবটি থেকে ইসতিফাদা করার কথা বলা শুরু করেছেন।

কিছু দিন পর আরেকটু আগ বেড়ে বলতে লাগলেন, 'শুধু মুতালাআর মাধ্যমে পরিপূর্ণ ইসতিফাদা হয় না। এটাকে তালীমে আনা দরকার।'

এর কিছু দিন পর আরেকটু অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু করলেন, 'একদিন ফাযায়েলের তালীম, আরেকদিন মুনতাখাবের তালীম। ঘরের মধ্যেও, মসজিদের মধ্যেও।'

এর কিছু দিন পর আরেকটু আগ বাড়িয়ে নির্দেশ করলেন, 'জামাতে প্রত্যেক সাথী অবশ্যই নিজের সঙ্গে কিতাবটি রাখবে।'

এরপর মারকাযে নিযামুদ্দিনেও সকাল বেলা মুনতাখাবের তালীম শুরু করে দিলেন। এখন সকাল-সন্ধ্যা জিহাদ বলাও হচ্ছে, পড়াও হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা কতোটা মুনাসিব (সমীচীন), তা ভেবে দেখা দরকার।

এরপর আরেকটু অগ্রসর হয়ে নির্দেশ করলেন, 'খুরুজের সময় সকালের তালীম মুনতাখাব থেকে হবে, আর বাদ যোহরের তালীম ফাযায়েল থেকে হবে।' অথচ যোহর পরবর্তী তালীম সবগুলো জামাতে কতটুকু সময় নিয়ে হয়, কীভাবে হয়, তা বিচার-বিশ্লেষণ করার দরকার ছিলো। দলিল দিচ্ছেন, 'ফাযায়েলের কিতাবগুলোর ওপর প্রচুর আপত্তি শোনা যাচ্ছে। এর বিপরীতে মুনতাখাব সবগুলো প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। তাদেরক লাজওয়াব বানিয়ে ছেড়েছে। অথচ কারো আপত্তি বা লাজবাব হওয়ার কারণে আমাদের লাভ-ক্ষতির কোনোটাই হয় না। আর বাস্তবতা হলো, শুধু মুনতাখাব হাদীস কিতাবের মাধ্যমে উম্মতের দ্বীনি জরুরত পূরণ হতে পারে না। এ কারণেই হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. পুরো উম্মতের দ্বীনি জরুরতের দিকে তাকিয়ে হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এর মাধ্যমে ফাযায়েলের সবগুলো কিতাব লিখিয়েছেন। আর মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. —যাঁকে মুনতাখাব হাদীস কিতাবের সংকলক বলা হচ্ছে— তিনি নিজেও হিদায়াতের মাঝে এ কথা বলেছেন যে,

ہماری تعلیم میں صرف حضرت شیخ کی ہی کتابیں پڑھی جائینگی.

'আমাদের তালীমে শুধু হযরত শায়খেরই কিতাবগুলো পড়া হবে।'

ইউসুফ সাহেবের এ হিদায়াত আল ফুরকান হযরতজি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

৩.

তৃতীয় কথা মাসতুরাত সম্পর্কে। যেখানে তাজভীদের হালকাও রয়েছে। তাজভীদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। এর প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এটি পরিচালনার পদ্ধতি ছিলো, সাথীদের পরস্পরে পরামর্শ হবে। এমন কোনো সুরতে কাজটি সম্পন্ন হবে যে, কারো কোনো আপত্তি বাকি থাকবে না। কোনো দেশ এ কাজ গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে

না। অথচ কিছু দেশের যিম্মাদার জানিয়েছেন, এ কাজগুলো তাদের দেশে না করা হোক।

৪.

প্রথম থেকেই বিভিন্ন সময় বয়ানের মাঝে আপনাকে অসতর্ক হতে দেখা যেতো। দাওয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি ও সকল আকাবিরের মানহাজ থেকে কথা বলতেও দেখেছি। তখন ভেবেছিলাম, এখনো আপনার বয়স কম। দাওয়াতের আমলি ময়দানে সময় না দেওয়ার কারণে এ সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনি শুধরে যাবেন। এজন্যে কখনো মুখ খুলিনি। কিন্তু যখন অনুভব করলাম, এ বিষয়গুলোর দিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করা সময়ের অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্যে হীতাকাঙ্ক্ষী হয়ে চেষ্টাও করেছি। কিন্তু সেই চেষ্টাকে আপনি মুম্বাইয়ের জোড়ের সময় হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে 'মুনাযারা' নাম দিয়ে বলেছিলেন,

کچھ لوگ مجھ سے مناظرہ کرنے آئے تھے اور بزرگوں کی طرف سے ملے ہوئے طریقہ کار کو اور موقف کو تجربہ نام دیا ہے.

'কিছু লোক আমার সঙ্গে মুনাযারা করতে এসেছিলো। তারা বুযুর্গদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে 'অভিজ্ঞতা' নাম দিয়েছে।'

আপনি এ কথাও বলেছিলেন,

مجھے آکر تجربہ سنا رہے ہیں، حالانکہ یہ کام تجربہ کا نہیں سیرت کا ہے. اور مجھے کہتے ہیں کہ مشورہ نہیں کرتا، مشورہ میں کس سے کروں کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا.

'আমার কাছে এসে 'অভিজ্ঞতা' শোনাচ্ছে। অথচ এই কাজ অভিজ্ঞতার নয়; এটি সীরাতের কাজ। আমার সম্বন্ধে বলে, আমি মাশওয়ারা করি না। মশওয়ারা কার সঙ্গে করব? কেউ তো কাজ করতেই চায় না।'

হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ. এর বিজ্ঞসুলভ কর্মপদ্ধতির কারণে আহলে হকের সবগুলো ঘরানা এই মেহনতের সহায়ক, সমর্থক হয়েছিলেন। তাঁরা প্রাণ খুলে এ মেহনতের জন্যে দুআ করে থাকেন। কিন্তু আপনার বিভিন্ন বয়ানে অসতর্কতা ও অসংলগ্ন কথাবার্তার কারণে অনেক বড় দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। সেই দূরত্ব দিনদিন বেড়েই চলেছে। এমনকি হকপন্থীদের মুখে এখন এ ধরনের কথাও উঠছে যে, 'মাওলানা ইলয়াস রহ. এর তাবলীগ খতম হয়ে গেছে। এখন তো এই মেহনতের মাঝে অনেকগুলো ক্ষতিকর দিক জন্ম নিয়েছে।' অথচ আমরা সবসময় তাদের সমর্থন, দুআ ও সহায়তার মুখাপেক্ষী।

বয়ানের মাঝে দ্বীনের বিভিন্ন ঘরানার ওপর সমালোচনা করা কখনই আমাদের বড়দের কর্মপদ্ধতি ছিলো না। যেমন, আসবাব তথা মাধ্যম অবলম্বনকে শিরক বলা, উলামায়ে কেরামের ধর্মীয় সেবার ওপর বিনিময় গ্রহণকে নাজায়েয অভিহিত করা, বিজ্ঞানকে শিরক বলা, কথায় কথায় অবলীলায় হারাম, শিরক, নাজায়েয ও বিদআত বলে বসা— এগুলো আমাদের বড়দের কর্মপদ্ধতি নয়। সবসময় আমাদের এখানে এই উসুলের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে যে, মাসআলা-মাসাইলের তাহকিক উলামায়ে কেরামের কাছ জেনে নেওয়া।

<u>৫.</u>

আমি শুরু থেকেই এই মুবারক মেহনতের তিনটি বড় বৈশিষ্ট্য দেখে এসেছি। اجتماعیت قلوب [ইজতিমাইয়্যাতে কুলুব—সবার অন্তরের ঐক্য], اتحاد فکر [ইত্তিহাতে ফিকর—চিন্তার ঐক্য] ও وحدت کلمہ [ওয়াহদাতে কালিমাহ—বলার ঐক্য]। এই তিন বৈশিষ্ট্যই এখন ভাঙ্গতে বসেছে। রায়ভেন্ড মারকায মাওলানা ইউসুফ রহ. নির্দেশিত পুরনো রুখের ওপর চলছে। আপনি এখানে নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সংযুক্ত করেছেন। যা নতুন। গোটা দুনিয়াতে নিযামুদ্দিন ও রায়ভেন্ড উভয় মারকায থেকে জামাত যাচ্ছে। নিযামুদ্দিন থেকে প্রেরীত জামাতগুলো আপনার নির্দেশিত কথাগুলোর ওপর চলছে। কেননা আপনি নিজেই রওয়ানা হওয়ার সময় উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর ওপর চলার হিদায়াত দিয়ে থাকেন। আবার ফেরার

পর কারগুজারি নেওয়ার সময়ও প্রশ্ন করে থাকেন যে, উপর্যুক্ত কথাগুলোর ওপর জামাত পরিচালিত হয়েছে, কি হয়নি? যার কারণে প্রতিটি জামাত জবাবদিহিতার ভয়ে উপর্যুক্ত রুখের ওপরই আমল করে থাকে, যেন ফেরার পর পাকড়াওয়ের শিকার না হতে হয়। বিষয়গুলো উপযুক্ত না হলেও তারা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে বলে ফেলে, খুব উপযোগী হয়েছে। অর্থাৎ পুরো দাওয়াতের কাজ এখন সংকুচিত হয়ে 'মুনতাখাব আহাদিস এবং দাওয়াত, তালীম ও ইসতিকবালের মাঝে সীমিত হয়ে পড়েছে। অথচ পাকিস্তানি জামাতগুলো এগুলোর ধারে-কাছেও ঘেষে না। দুনিয়াতে উভয় দেশের মানুষ রয়েছে এবং উভয় দেশ থেকে প্রভাবিত মানুষও রয়েছে।

যারা হিন্দুস্তানের মানুষ ও নিযামুদ্দিন থেকে প্রভাবিত তারা বলে, নিযামুদ্দিন থেকে যেই নির্দেশনা আসে, জামাত সে অনুসারে পরিচালনা করো। এভাবে পরিচালনা না করলে খিয়ানত হবে।

আর যারা রায়ভেন্ড মারকাযের মাধ্যমে প্রভাবিত তারা বলে, এই নতুন জিনিসগুলো অতীতের বড়দের যুগে ছিলো না। এখন পর্যন্ত এই নতুন বিষয়গুলোর ওপর কোনো পরামর্শও হয়নি। কাজেই এগুলোর ওপর জামাত পরিচালনা করলে খেয়ানত হবে।

এই ইখতিলাফ এখন মসজিদে-মসজিদে, ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে গেছে। وحدت کلمہ [ওয়াহদাতে কালিমাহ] যা আমাদের অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য ছিলো, এখন ভেঙ্গে পড়েছে। اجتماعیت قلوب [ইজতিমাইয়্যাতে কুলুব], اتحاد فکر [ইত্তিহাতে ফিকর]-ও খতম হয়ে গেছে। সেগুলোর স্থলে এখন সর্বত্র শুধু বিশৃঙ্খলাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সব জায়গায় ইখতিলাফ, ঝগড়া ও বাদানুবাদ হচ্ছে। এর পূর্ণ দায়ভার এককভাবে আপনার উপরেই বর্তায়। আপনি আপনার নিজের বয়ানগুলোতে এ কথা বলে থাকেন যে, 'এই কাজ সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতিতে পরিচালনা করুন'। আপনার কথার অর্থ হলো, এতো দিন পর্যন্ত এই মেহনত সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতির ওপর পরিচালিত হয়নি। এখন সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতির ওপর তোলার প্রয়াস হচ্ছে। আপনার এ কথা নিজেদের বড়দের ওপর অনেক বড় অপবাদ যে, তারা যেমন সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতি বুঝেননি, তেমনই সেই পদ্ধতির ওপরই

এই মেহনত পরিচালিত করেননি। কাজেই আপনি এখন এ কাজের তাজদীদ—শুদ্ধিকরণ চাচ্ছেন।

৬.

আজকাল আপনি আপনার বিভিন্ন বয়ানের মাঝে আনুগত্যের ওপর খুব বেশি জোর দিচ্ছেন। আপনি বিগত জোড়ে এ কথা বলেছেন,

مولوی ابراہیم اور مولوی یعقوب سب کے ۔ ی ماہوں کہ کون کیا کہ رہا ہے،
جو انشراح کی بات کر ی ماہے اور کہتا ہے کہ مشورہ نہیں ہوا وہ جاہل ہے.

> ‘মৌলভি ইবরাহিম (দেউলা) ও মৌলভি ইয়াকুব-সবার সবগুলো বয়ান শুনি যে, কে কী বলছে। যারা ঘরের কথা বাইরে ছড়ায় আর বলে যে, মাশওয়ারা হয় না, তারা জাহেল।’

আপনি আপনার উসতাযদেরকে জাহেল বলছেন। তখনই মজমার কয়েকজন সাথী আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চেয়েছিলো। এমন তর্ক আগামীতেও উঠতে পারে। আপনার দুঃসাহস ও বেয়াদবি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো কিছু লোকও এ কথা নকল করা শুরু করেছে। পদমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখার গুণ এ যুগে নিঃশেষ হয়ে গেছে। বয়স্ক লোকদের কাছে শুনেছি, হযরত মাওলানা ইলয়াস রাদি. অধিকাংশ সময় বলতেন,

گر فرق مرا ی ب نہ کنی زندیقی

> ‘যদি তুমি প্রত্যেকের পদমর্যাদার লেহাজ না করো তাহলে তুমি ধর্মহীনসুলভ কাজ করলে।’

আপনি কি চাচ্ছেন যে, অতীতের আকাবির ও বুযুর্গদের পদ্ধতির বিরুদ্ধে গিয়ে আপনার কথাগুলোর ওপর সবাই অনুসরণ করুক? আপনি গাড়ি এমনভাবে চালাচ্ছেন যে, এই গাড়ির হর্ন-ও নেই, ব্রেক-ও নেই। মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁধবেই। সেই সংঘর্ষের ফলে আপনি নিজেও ক্ষত-বিক্ষত হবেন, অন্যদেরও বিক্ষত করবেন। নিযামুদ্দিনের বেশ কজন প্রবীণকে আপনি ধমকি দিয়েছেন যে, যদি আমার কথা অনুসারে চলতে না পারেন তাহলে এখানে থাকতে পারবেন না। সব জায়গায় এখন প্রবীন ও নবীন– পুরাতনপন্থী ও নতুনপন্থী নামে দুটি শিবিরে বিভাজন চলছে। নবীনরা

বলছে, পুরনো নিযামুদ্দিনের কথা চলবে না। এখন আমরা পুরাতনপন্থীদেরকে সরিয়ে নিজেরাই নিযামুদ্দিনের কথা অনুসারে পরিচালনা করব।

সব জায়গায় এ ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে; বরং এখন তো পরিলক্ষিত-ও হচ্ছে যে, এই বিশ্বকল্যাণের কাজ ও আলমি মেহনত নিজের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। ইতোমধ্যে বিচ্যুতি শুরুও হয়ে গেছে। এতোদিন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে আসা পুরনো সাথীরা প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ে গেছেন যে, হচ্ছে-টা কী? আপনার সম্বন্ধে মানুষ এমন এমন মন্তব্য করছে যে, সেগুলো কাগজের ওপর লিখতেও পারছি না। তবে نقل کفر کفر نباشد (কারো কুফরি কথা নকল করা কুফরি নয়) ভিত্তিতে কিছু মন্তব্য তুলে ধরছি। কেউ বলছে, ‘এ লোকের ওপর যাদুটোনা হয়েছে।’ ‘যাদুর কারণে উল্টা-পাল্টা বকছে।’ ‘জেনে-না জেনে কারো কলের পুতুল হয়ে কাজ করছে।’ ‘এ লোকটি বিক্রি হয়ে গেছে।’ ‘এ লোকটির মাথায় বুদ্ধি কম। বুদ্ধি থাকলে কি এভাবে নিজের বাপ-দাদার লাগানো বাগান ধ্বসং করার কাজে উঠে-পড়ে লাগে!’ ‘মাদরাসার সিঁড়ি ভেঙ্গে মাদরাসার অংশ নিজের ঘরের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছে।’ ‘এ লোক আত্মসাৎকারী।’ ইত্যাদি

৭.

হযরতজি রহ. এর মনোনীত আলমি শুরা –আপনি নিজেও যে শুরার একজন সদস্য– হযরত রহ. এর ইনতিকালের পর দুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। একটি হলো, নিযামুদ্দিনের কোনো দায়িত্বশীল বাইআত করাবেন না। নিযামুদ্দিনে বাইআতের কাজ চলবে না। এই সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান দেখিয়ে মাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ. সারা জীবন কাউকে বাইআত করাননি। যদিও বিভিন্নজন অনুরোধ-অনুনয় করেছিলো; কিন্তু তিনি সবসময় এ উত্তর দিতেন যে, মাশওয়ারায় নিষেধ করা হয়েছে।

তাঁর ইনতিকালের পরপরই আপনি বাইআত শুরু করে দিয়েছেন এবং মাওলানা ইলয়াস রহ. এর হাতে বাইআত নিচ্ছেন। (আপনি যার মুজায নন)। প্রতিদিন মাগরিবের পর আপনার কামরার সামনে একদল মানুষের সমবেত হয়। গোটা মসজিদ দেখতে পাচ্ছে, এখানে কী হচ্ছে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ছিলো, নিযামুদ্দিন, রায়ভেন্ড ও কাকরাইলে কোনো বিষয় চালু করার পূর্বে তার ওপর আলমি শুরা একমত হওয়া আবশ্যক। আপনি উপর্যুক্ত সবগুলো বিষয় শুরার মাশওয়ারা ছাড়াই চালু করে দিয়েছেন। যাবতীয় বিশৃঙ্খলার এটাই একক কারণ।

আলোচিত সবগুলো বেউসুলির কারণ হলো, মাশওয়ারা না করা ও আমলি অভিজ্ঞতার কমতি। কারণ, আপনি সাধারণ মেহনতে সময় দেননি এবং কারো সাহচার্য পাননি। দ্বিতীয় কারণ হলো, নেতৃত্বের এই অহমিকা যে, আমি আমির। আমার কাউকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। অথচ বাস্তবতা হলো, নিজে নিজে কেউ আমির হতে পারে না। বরং আহলুর রায়ের পক্ষ থেকে আমির বানানো হয়।

এখন যদি এসব জটিলতার নিরসন করতে হয়, যদি এই মেহনত ও মেহনতের সাথীদেরকে সঠিক পথের ওপর বহাল রাখতে হয় তাহলে একটাই সমাধান। তাহলো, নিজের ভুলগুলোকে ‘আযিমত’—‘প্রত্যয়’ নাম না দিয়ে, কাজকারীদের অভিযুক্ত না করে, নেতৃত্বের অহমিকা থেকে বেরিয়ে, নেতৃত্বের ফেতনাকারীদের নিষেধ করে, মেহনতকারীদের সামনে নিজের যাবতীয় ভুল থেকে রুজু করা। এবং নিজেকে মেহনতকারীদের একজন সাধারণ সদস্য মনে করে নিজের সত্তা ও মেহনতকে শুরা ও মাশওয়ারার অনুগত বানিয়ে নেওয়া।

আপনার একাকী বিভিন্ন সফরে যাওয়ার ওপরও মানুষ আঙুল তুলছে। আপনি যখন কান্ধলার বাংলোতে ছিলেন তখন সেখানে সন্দেহজনক কিছু মানুষের যাতায়াত নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কাজেই আপনি যদি এই মেহনতের হিফাযত চান, মেহনতকারীদের হিফাযত চান, আপনার নিজের হিফাযত চান তাহলে আপনি নিজেকে শুরা ও মাশওয়ার অনুগত বানিয়ে দিন।

পূর্ববর্তী চিঠিতে আপনার সামনে শুরার যেই নামগুলো পেশ করা হয়েছিলো অর্থাৎ মাওলানা সাদ সাহেব, মাওলানা ইবরাহিম সাহেব, মাওলানা ইয়াকুব সাহেব ও মাওলানা আহমদ লাট সাহেব; আমরা সবাই নিবেদন করছি যে, সেই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন শুরু করে দিন। অর্থাৎ নিযামুদ্দিন মারকাযে এই

চার হযরত পালাবদল করে একেক সপ্তাহ ফয়সাল—সিদ্ধান্তদাতার দায়িত্ব পালন করবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ও পুরো উম্মাতে মুসলিমার সমস্ত যোগ্যতা দ্বীনের প্রচার-প্রসারের কাজে কবুল করুন। যাবতীয় দুর্বলতা নিজ অনুগ্রহে দূর করে দিন। এই সুউচ্চ ও মুবারক মেহনত নিরাপদ রাখুন, বড়দের চালু করা মানহাজের হিফাযত করুন। এই কল্যাণকর মেহনতের মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমাকে কিয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন। আমীন।

ওয়াস সালাম

প্রেরক

১. ফারুক আহমদ, ব্যাঙ্গলোর
২. ডক্টর খালেদ সিদ্দিকি, আলিগড়
৩. মৌলভি মুহাম্মদ ইসমাঈল, গোধরা
৪. প্রফেসর আবদুর রহমান
৫. মৌলভি আবদুর রহমান রোমাঈ
৬. প্রফেসর সানাউল্লাহ খান আলীগ

দ্বিতীয় চিঠি

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

শ্রদ্ধেয় হযরত মাওলানা সাদ সাহেব [মহান আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাকে এমন কাজ করার তাওফিক দিন, যা তিনি ভালোবাসেন ও যার ওপর সন্তুষ্ট হন।]

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহ।

এই চিঠি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দাওয়াতের মহৎ মেহনত ও উম্মাহর কল্যাণকামিতা চেয়ে লেখা হচ্ছে।

বিগত কয়েক মাস ধরে নিযামুদ্দিন মারকাযের যেই হালত চলছে, তার কারণে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল সুহৃদ ও উম্মাহর জনে হৃদয়ে অন্তর্জ্বালা পোষণকারী সকল মুসলমান অত্যন্ত ব্যথিত ও পেরেশান। তারা অস্থিরতা বোধ করছেন এবং উত্তরণের দুআ করছেন। এই উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে মেহনতের এবং নিযামুদ্দিনের শত বছরের পবিত্রতা পদদলিত হচ্ছে।

এ সকল ফ্যাসাদের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে, এটি দু'জন ব্যক্তিত্ব ও তার সমর্থকদের মাঝখানে নেতৃত্বের লড়াইয়ের কারণে হচ্ছে। অথচ বাস্তবতা হলো, এটি মানহাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির মতভিন্নতার মাসআলা। যেই মতভিন্নতা দূর করার অনেকগুলো প্রয়াস আমরা দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছি। কিন্তু এখন আপনার সমর্থকেরা এ সমস্যাটি এমন কিছু লোকের হাতে তুলে দিয়েছে যারা কঠোরতার মাধ্যমে বলপ্রয়োগ করে নিজেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে। এমন ধমকিও ছুড়ে দিচ্ছে যে, যারা মানবে না তাদের ওপর আমরা হাত তুলবো।

মূল সমস্যা হলো, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. ও মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর সময়কার পুরনো সাথীরা চাচ্ছেন যে, এই মেহনত যেভাবে শুরার অধীনের পরিচালিত হয়ে আসছে, এভাবেই

পরিচালিত হোক। আর আপনার সমর্থকেরা চাচ্ছে যে, আপনি নেতৃত্ব কায়েম হোক।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. এর একটি চিঠি আমরা মাকাতিব থেকে আমার কাছে নিয়ে এসেছি। সেই চিঠি পড়লে বুঝে আসে যে, মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. চাইতেন, আগামীতে এই মেহনত শুরার অধীনেই পরিচালিত হোক। কোনো ব্যক্তিবিশেষের মাধ্যমে কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়া নিয়ে তার দ্বিধা ছিলো। পৃথিবীর কোনো মানুষ দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নন। যুগের অধপতনের সাথে সাথে ব্যক্তির দুর্বলতাও বেড়ে চলেছে। এর সমাধান হিসেবে মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. মনে করেন, একদল সাথীর একটি জামাত সবসময় ময়দানে থাকবে। তাদের নেতৃত্ব ও রাহবারির মাধ্যমে এ কাজ পরিচালিত হবে। আমাদের সবার, দেশের বিভিন্ন প্রদেশের পুরনো সাথীদের এবং একই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন দেশের পুরনো সাথীদের এটাই মনোভাব।

আপনি এমন কিছু নতুন কাজ শুরু করে দিয়েছেন, যা আমাদের পূর্ববর্তী বড়দের যুগে ছিলো না। বিষয়গুলোর প্রতি বারবার আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এগুলোর কারণে আমাদের ওয়াহদাতে কালিমা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সার্বিক কর্মকাণ্ড জাহান্নামমুখী হয়েছে। প্রতিটি প্রদেশে ঝগড়া হচ্ছে। মসজিদে-মসজিদে ঝগড়ার প্রভাব ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহ না করুন, আগামীতে এই মেহনত সেই আশঙ্কার সম্মুখীন হতে পারে যার ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. সতর্ক করে গিয়েছিলেন যে, 'যদি এ কাজের মাঝে বেউসুলি করা হয় তাহলে যেই ফেতনা আসতে কয়েক শতাব্দী লাগার কথা, সেই ফেতনা কয়েক দিনের মধ্যেই চলে আসতে পারে।' যার পূর্বলক্ষণ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত আপনি আপনার বয়ানের মাঝে এমন অনেকগুলো কথা বলে থাকেন যা সালাফ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মতাদর্শের পরিপন্থী। আপনার সঙ্গীরাও সেই কথাগুলো নকল করে থাকেন। যা নিয়ে উলামায়ে কেরাম দুঃশ্চিন্তা বোধ করছেন যে, কাজের গতিমুখ কোন দিকে ছুটছে। অথচ আমাদের করণীয় ছিলো, আমরা মাসলাক ও মাসআলার

ক্ষেত্রে জমহুর উলামায়ে কেরামের অনুসরণ করবো। আপনার বয়ানের মাঝে দ্বীনের বিভিন্ন শাখা ও ব্যক্তিত্বের ওপর সমালোচনা উঠে আসছে। অথচ বড়রা এই কাজের মাঝে কোনো ব্যক্তিবিশেষের সমালোচনা, ছিদ্রান্বেষণ ও প্রতিবাদ-প্রত্যাখ্যান করা থেকে নিষেধ করে থাকেন। আমাদের বড়রা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতেন। আহলে হকের সহায়তা, সমর্থন ও দুআর কাছে আমরা সবসময় মুখাপেক্ষী।

সবশেষে আমাদের নিবেদন হলো, মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর ওপর আল্লাহ তাআলা কাজের ইলহাম করেছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. কুরআন-হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলির আলোকে এ কাজের প্রতিটি শাখার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. সেগুলোকে বিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল করেছেন। আমরা প্রত্যাশা করি, এই মেহনত তাঁদের নির্দেশিত পথে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করে চলুক। যদি কোনো ধরনের সংযোজনের প্রয়োজন অনুভূত হয় তাহলে তিন দেশের সম্মিলিত শুরার ঐক্যমতে হোক।

আমরা আমাদের জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমরা এ কথা স্পষ্ট করে দিতে চাচ্ছি যে, বর্তমান পরিস্থিতির ওপর আমরা সন্তুষ্ট নই। যার কারণে আমরা এবারের ত্রয়মাসিক মাশওয়ারায় উপস্থিত হতে পারছি না। এই মেহনত যেভাবে এতোদিন শুরার অধীনে পরিচালিত হচ্ছিলো, সেই পদ্ধতির ওপর বহাল রেখেই পরিচালিত হওয়া উচিত। নয়তো আমরা এবং দেশের সকল পুরনো সাথী আপনার সঙ্গে চলতে পারবো না। আমরা নিজেদের মতো করে আমাদের এলাকায় কাজ করে যাবো। দাওয়াত আমাদের জীবনের লক্ষ্য। তাবলীগ আমাদের সারা জীবনের কাজ। নিযামুদ্দিন আমাদের ঘর। পরিবেশ-পরিস্থিতি যখন ঠিক হয়ে যাবে ু ইনশাআল্লাহ- আমরা হাজির হবো।

বর্তমানে সবখানের চিত্র হলো, পুরো দুনিয়াতে ব্যাপকাকারে এবং আমাদের দেশে বিশেষাকারে সব জায়গায় কাজের মেহনতি সাথীরা কাজের ফিকির ছেড়ে দিয়ে নিজেদের মজলিসে নিযামুদ্দিনের অবস্থা নিয়ে পরস্পরে কথাবার্তা বলছেন। এখন প্রতিটি মজলিসের বিষয়বস্তু নিযামুদ্দিন

হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এই সমস্যা থেকে উদ্ধার করুন, আমাদেরকে কাজের ফিকিরের রুখে ফিরিয়ে আনুন। আমীন।

ওয়াস-সালাম

১. মাওলানা ইসমাঈল গোধরা
২. মাওলানা আবদুর রহমান রুমাই (মুম্বাই)
৩. মাওলানা উসমান কাকুসি
৪. জনাব ফারুক আহমদ ব্যাঙ্গলোর
৫. জনাব মুহসিন উসমানি
৬. জনাব সানাউল্লাহ খান আলীগ
৭. জনাব প্রফেসর আবদুর রহমান মাদ্রাজ

১২ শাওয়াল ১৪৩৭ হিজরি
১৭ জুলাই ২০১৬ ঈসায়ি

মাওলানা ইবরাহিম দেউলা সাহেবের চিঠি

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

১২.৮.২০১৬ তারিখ সন্ধ্যায় অধমের বাংলেওয়ালি মসজিদ মারকাযে নিযামুদ্দিন থেকে গুজরাট প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে এ সময় নানা ধরনের গুজব বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। যা পরিপূর্ণ মিথ্যা ও অবাস্তব। এজন্যে মনে হলো, আমি নিজেই যদি মূল বাস্তবতা তুলে ধরি, সেটাই সমীচীন হবে।

১.

এ বছর ২০১৬ এর মাহে রমাযান থেকে অদ্যাবধি বাংলেওয়ালি মসজিদ মারকাযে নিযামুদ্দিনে যেসব ঘটনা ঘটেছে এবং কয়েক দিন পূর্বে খোদ আমার উপস্থিতিতে যে ঘটনাটি ঘটেছে, এমন অসমীচীন ঘটনাগুলোর কারণে এই মুবারক মেহনতের হুলিয়া বিকৃত হয়ে গেছে। বছরের পর বছর মেহনতের মাধ্যমে অর্জিত পবিত্রতা পদদলিত হয়েছে। যার কারণে গোটা দুনিয়ার মেহনতের সাথী, আল্লাহওয়ালা উলামায়ে কেরাম ও শ্রদ্ধেয় বুযুর্গানে দ্বীন খবুই মর্মাহত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। বর্তমান চালচিত্রের কারণে একদিকে মেহনতের ঐক্যে বড় ধরনের ফাটল ধরেছে। অন্যদিকে বাংলেওয়ালি মসজিদের মাঝে এমন একটি গোষ্ঠী জেঁকে বসেছে, যারা বরাবরই ভুল কথাগুলোকে সঠিক প্রমাণিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সংশোধনের সহায়ক কোনো পদক্ষেপ কেউ নিলে ওরাই তার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাবলীগের মেহনতের জন্যে এটি খুবই বিপদজনক ও ভয়াবহ চালচিত্র। এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে দূরদর্শিতার সঙ্গে। যেসব লোক মনে করে, এ মুহূর্তে মারকাযে কোনো সমস্যা নেই। কাজ তার নিজস্ব গতিতে চলছে, তার নির্জলা মিথ্যা ও অবাস্তব কথা বলছে।

২.

এ বছর ঈদুল ফিতরের পর আমি মনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাংলেওয়ালি মসজিদে যাওয়ার নিয়ত করি। যাওয়ার পূর্বে আমার মনে হয়েছিলো, ইনশাআল্লাহ, খুবই দ্রুত আমরা পারস্পরিক বোঝাবুঝির মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যাবলির সমাধানে উপনীত হতে পারবো। সেই ভাবনা থেকেই আমি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কয়েকবার মৌলভি সাদ সাহেবের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছি। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, কোনো ফলপ্রসু পরিণতি বের করতে পারিনি। বরং আমার নিযামুদ্দিনে অবস্থান ও প্রতিদিনের মাশওয়ারায় উপস্থিত হওয়ার সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে এ কথা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিলো যে, আমি কাজের বর্তমান তরতিব ও পদ্ধতির সমর্থক। এটাই যখন বর্তমানের চিত্র, তখন আমি যদি এ বিষয়ে আমার অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি সবার সামনে তুলে না ধরি তাহলে তা দ্বীনের ক্ষেত্রে অন্যের লেজুড়বৃত্তির নামান্তর হবে। এ কারণে আমি নিম্নে সারা দুনিয়ার সাথীদের সামনে আমার নিজের অবস্থা পরিষ্কার শব্দে তুলে ধরছি—

বর্তমান সময়ে দাওয়াতের এই মুবারক মেহনতের পরিধি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে গেছে। লাখ লাখ মানুষ এ কাজের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে নিয়েছে। বিভিন্ন মানসিকতা ও বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ এই মেহনতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। কাজেই এ কথা সূর্যের মতো পরিষ্কার যে, এতো সুবিস্তৃত ও ব্যাপক কাজের দায়িত্ব বহন করার জন্যে প্রয়োজন এমন একটি নির্ভরযোগ্য জামাত— যার সদস্যগণ পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সংশ্রবে জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন, যাদের তাকওয়া, বিশ্বস্ততা, কাজের জন্যে নিজেকে একনিষ্ঠভাবে নিবেদন ও আত্মসমর্পণ, লিল্লাহিয়্যাত, মেহনত ও মুজাহাদার গুণাবলির ওপর সবাই একমত। এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জামাত পারস্পরিক পরামর্শ ও একতার সঙ্গে কাজটিকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবেন। এগুলো ব্যতিরেকে এই মুবারক মেহনতটিকে সঠিক গন্তব্যের ওপর রাখা মুশকিল হয়ে যাবে এবং সমগ্র দুনিয়ার মেহনতের সাথীদের মাঝে ঐক্য ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

এজন্যেই হযরত মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব রহ. এর জীবদ্দশাতেই বেশ কিছু অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা সামনে চলে আসায় কয়েকবার

হজরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. কর্তৃক গঠিত শুরার মাঝে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কয়েকজন সদস্যকে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা পেশ করা হয়েছিলো। তখন এ দরখাস্ত পেশ করা হয়েছিলা যে, আগামীর ঘটিতব্য বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এর মাঝেই নিহিত। জীবনসায়াহ্নে হযরত মরহুম এর জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুতও হয়েছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর আখেরাতের ডাক এসে পড়ে। মহান আল্লাহ তাঁকে মাগফিরাত দান করুন। তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন।

হযরত রহ. এর ইনতিকালের পর আমরা পুরনো সাথীদের মাশওয়ারায় একটি বিশদ বিবরণ সম্বলিত চিঠি মৌলভি সাদ সাহেব বরাবর প্রেরণ করেছিলাম। ওই চিঠির মাঝে মেহনতের বর্তমান তরতিব ও পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের মনোকষ্ট ও দুঃশ্চিন্তার কথা তুলে ধরেছিলাম। উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্যে শুরা কায়েম করার কথাও বলেছিলাম। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আমাদের সেই উদ্যোগের কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি। মেহনতের ক্রমশ বিপর্যয় ঘটতে থাকে।

এর কিছু দিন পর গত বছর অর্থাৎ ২০১৫ এর নভেম্বর মাসে দুনিয়ার পুরনো সাথীদের উপস্থিতিতে শুরার শূন্যপদগুলো পূরণ করা হয়। তখন আমি পুনরায় মৌলভি সাদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলি যে, আপনি এই শুরা মেনে নিন। ইনশাআল্লাহ, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি তা মানতে অসম্মতি জানান। যার ফলে গোটা দুনিয়াতে তাবলীগের মেহনতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতির মারাত্মক বিপর্যয় ঘটেছে। এখনো আমার মতে যাবতীয় সমস্যার একটাই সমাধান যে, সেই শুরা মেনে নেওয়া হোক এবং মেহনতের যাবতীয় চাহিদা শুরার সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পূরণ করা হোক।

কাজের তরতিব ও পদ্ধতির ব্যাপারে আমার অভিমত হলো, বিগত তিন হযরতের যুগে যেই বিষয়গুলো সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত, সেগুলোকে নিজ আসল সুরতের ওপর বহাল রাখা হোক। যদি সেগুলোর মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন বা সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তা শুরার সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই নেয়া হোক। বর্তমান সময়ে ঐক্যের দেয়ালে

ফাটল ধরার সবচেয়ে বড় কারণ হলো, শুরা ও পুরনো সাথীদের মাশওয়ারা ও আস্থা ছাড়াই নতুন কিছু তরতিব ও বিষয় যুক্ত করা হয়েছে ।

দ্বীন ও শরিয়াহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই তাবলীগি জামাত জমহুর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের শতভাগ অনুসারী। কুরআন কারিমের যেকোনো আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে আমরা জমহুর মুফাসসিরিন, যেকোনো হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জমহুর মুহাদ্দিসিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ থেকে ইসতিমবাত ও ইসতিখরাজ তথা শিক্ষা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও আমরা জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের অভিমতের শতভাগ অনুসারী। অতীতের তিন যুগে আমাদের বড়গণ এমনই ছিলেন। কারণ, এর বাইরে গেলে দ্বীনের ক্ষেত্রে তাহরিফ তথা বিকৃতির দুয়ার খুলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

দাওয়াতের এই মেহনতে শুরু থেকেই বয়ানের ক্ষেত্রে সতর্ক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। অনির্ভরযোগ্য কথা, ইজতিহাদ ও ভুল দলিল থেকে পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্যেই নির্দেশ দেওয়া হতো যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বয়ান ছয় সিফাতের সীমারেখার ভেতর রাখবে। কোনো আয়াত বা হাদীসের ব্যাখ্যা করতে হলে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের সূত্রে বলতে হবে। বড়গণ সবসময় প্রতিবাদ, ছিদ্রান্বেষণ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আকাইদ, মাসাইল ও বর্তমান পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো এড়িয়ে যেতেন। এই মেহনতের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উসুল হলো, কোনো দ্বীনি জামাত বা সদস্যের সমালোচনা ও নিরীক্ষণ করা যাবে না। কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেক সাথী; এমনকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদারকে দেখা যাচ্ছে, তারা নিজ বয়ানের মাঝে এতোদিনের সীমারেখা ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষত সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ থেকে ভুল দলিল দেওয়া হচ্ছে। প্রায়সময় দ্বীনের বিভিন্ন সংগঠন ও ঘারানার সমালোচনা ও ছিদ্রান্বেষণ হচ্ছে।

তাদের এহেন কর্মকাণ্ডের ওপর আমি অধম শুরু থেকেই সন্তুষ্ট ছিলাম না। অসংখ্যবার বিষয়টির ওপর তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টাও করেছি। আমার নিজের বয়ানের মাঝেও ইতিবাচকভাবে সতর্ক করার চেষ্টা নিয়মিত করে এসেছি।

কিন্তু যখন দেখলাম, তাদের সেই আচরণ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বাংলেওয়ালি মসজিদে আমার অবস্থানকে জড়িয়ে কিছু লোক ভুল মতলব ছড়াচ্ছে যে, কাজের বর্তমান তরতিব ও গতি-প্রকৃতির ওপর আমি সন্তুষ্ট; উপরন্তু বাংলেওয়ালি মসজিদের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে আমার দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হয়ে পড়ে, তখন কয়েক দিন ইসতিখারা করে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, মেহনতের সাথীদের সামনে আমার নিজস্ব অবস্থান পরিষ্কার করা দরকার। যখন পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটবে তখন এ বান্দা পুনরায় উপস্থিত হতে বিন্দু পরিমাণ দেরি করব না। আমি কারো প্রতিপক্ষ হয়ে গুজরাটে ফিরে যাইনি; বরং কাজের হিফাযতের স্বার্থে এবং চাটুকারিতা থেকে বাঁচতেই ফিরে এসেছি। আল্লাহর কাছে আমাকেও জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তাআলা এই মেহনত ও এর সাথীদেরকে নিরাপদ রাখুন। আমীন।

বান্দা ইবরাহিম দেউলা
বর্তমান অবস্থান : দেউলা,
জেলা : ভারুঞ্চ,
প্রদেশ : গুজরাট
১৫ আগস্ট ২০১২। রোববার

রায়ভেন্ডের চিঠি

১৮ শাওয়াল ১৪৩৭ হিজরি
২৩ জুলাই ২০১৬ ঈসায়ি

শ্রদ্ধেয় জনাব মৌলভি মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব, মৌলভি মুহাম্মদ ইবরাহিম সাহেব, মৌলভি আহমদ লাট সাহেব, মৌলভি সাদ সাল্লামাহু ও মৌলভি যুহাইরুল হাসান সাল্লামাহু!

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ

আশা করি, ভালো ও সুস্থ আছেন এবং সৌহার্দ্যের সঙ্গে, পারস্পরিক সম্প্রীতির সঙ্গে দ্বীনের প্রচার ও আল্লাহর ঝাণ্ডা উঁচু করার মেহনতে দিন-রাত চেষ্টা করে চলেছেন। মহান আল্লাহ আমাদের সবার সুন্দর প্রয়াসগুলো কবুল করে সারা দুনিয়ার হিদায়াতের ফয়সালা করে দিন। আমীন।

এ বছর উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে হজের সফরে তিন দেশের কাফেলার এক জায়গায় অবস্থান করা কঠিন হয়ে পড়েছে। যার কারণে আমাদের মারকাযের সাথীরা পারস্পরিক পরামর্শ করে এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যিনি আমাদেরকে অর্থাৎ পাকিস্তানি হাজিদেরকে নিয়ে যাবেন, আমাদের সার্বিক অবস্থান, খাবার-দাবার, মিনা ও আরাফায় অবস্থান, ইত্যাদি তাঁর সঙ্গেই হবে। এর মাধ্যমে দেশের আইন-কানুনের চাহিদাও পূরণ হবে। আর আপনারাও আপনাদের দেশের লোকদের সঙ্গে অবস্থান করবেন!

বাকি রইলো মেহনতের বিষয়টি, তো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত হাজীদের পেছনে আমরা সবাই মেহনত করব। তাদেরকে আমাদের কাছে ডাকব। আমরাও তাদের কাছে যাব। কারণ, বনি আদমের প্রত্যেক

সদস্যের পেছনে মেহনত করা পুরো উম্মতের দায়িত্ব। পুরো উম্মতের ওপরই প্রত্যেক সদস্যের যিম্মাদারি বর্তায়।

ইনশাআল্লাহ, এতে উভয় পক্ষের মঙ্গল হবে।

সকল সুহৃদের খেদমতে অধমের পক্ষ থেকে মাসনুন সালাম।

ওয়াস-সালাম।

বান্দা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব
মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের চিঠি

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

দাওয়াতের সাথীদের উদ্দেশে কিছু কথা

নিযামুদ্দিনে আমি প্রায় ১৫ বছর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. এর সঙ্গে থেকেছি। তাঁর ইনতিকালের পর প্রায় ৩০ বছর মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর সঙ্গে থেকেছি। প্রায় ৫০ বছরের এই দীর্ঘ সময়ে তাঁদের দু'জনকে খুব কাছ থেকে দেখার ও দেশে-বিদেশে সঙ্গে থাকার সুযোগ মহান আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। এ দু' হযরাতের নির্দেশনা, পথপ্রদর্শন ও তত্ত্বাবধানে এই মহান ও উঁচু কাজ করার সৌভাগ্য আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছেন। তার আলোকে আমি এ কথা পূর্ণ ঈমানদারির সঙ্গে নিবেদন করছি যে, তাবলীগের এই মেহনতকে উপর্যুক্ত হযরতগণ রহ. যে পদ্ধতির ওপর রেখে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে সরে গেছে এবং বিচ্যুত হয়েছে।

আমাদের এই দু' মুরুব্বি যদিও সবার পূর্ণ সম্মতিতে 'আমির' মনোনীত হয়েছিলেন; কিন্তু তারা কখনই নেতৃত্বের দাবী তোলেননি। কখনো নির্দেশের সুরে কথা বলেননি। কখনো আমিত্ব জাহের করেননি। তাঁরা সবসময় নিজেদেরকে মাশওয়ারার অনুগত রাখতেন। তারা যখনই কোনো বিষয় চালু করতে চেয়েছেন, সাথীদের সবার সম্মতি নিয়েই করেছেন। আমির হওয়া সত্ত্বেও তারা সবসময় নিজেকে মাশওয়ারার অনুগত রেখেছেন। কিন্তু এখন ওই চিত্র পুরোপুরি বদলে গেছে। এখন নিজেকে আমির ঘোষণা করা হচ্ছে। কেউ কোনো কথা মানতে না চাইলে তাকে তা মানতে নানাভাবে বাধ্য করা হচ্ছে। যার ফলে এখন নিযামুদ্দিন মারকায

এতোটাই বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে যে, সেখানে গালি-গালাজ ও মারপিট পর্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

যেই নিযামুদ্দিন ছিলো উম্মতের ফিকির, নিজের ইসলাহ ও আখেরাত গুছানোর জায়গা, যে কেউ যেখানে এলে নিজের মাঝে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে নিয়ে যেতো, আজ নিযামুদ্দিনে সেই পরিবেশ নেই। এখানে নিযামুদ্দিনের সর্বত্র গীবত, কুধারণা ও অপবাদ আরোপের হিড়িক চলছে। যারা এই মেহনতকে সঠিক পদ্ধতির ওপর বহাল রাখতে চাচ্ছে, নিযামুদ্দিন মারকায তাদেরকে পরাজিত করার নিত্য-নতুন কৌশল তৈরির প্রজননকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এমন পরিবেশে এখন যারা আসছে, তাদের সংশোধন তো পরের কথা, তারা আরো অধপতনের শিকার হচ্ছে। যার ফলে কাজের স্প্রিট নিঃশেষ হয়ে গেছে। সেখানে আগতদের মস্তিষ্কে এ খোরাক দেওয়া হচ্ছে যে, 'অনুসরণ করলেই নাজাত পাবে (অনুসরণের শর্তে যা ইচ্ছে করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই) কিন্তু যদি অনুসরণ না করো, কোনো কথার বিরোধিতা করো তাহলে নাজাত পাবে না, চাই তুমি যতোই মুখলিস হও, যতোই কুরবানি দাও।'

নিযামুদ্দিন মারকাযের পরিবেশে পূর্বে যেই নিজের ইসলাহের ফিকির ছিলো, আখেরাত সাজানোর ফিকির ছিলো, দ্বীনের প্রতি হৃদয়ের ব্যাথা-বেদনা ও উম্মাহর প্রতি সহমর্মিতার যেই অন্তর্জ্বালা ছিলো, এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার স্থানে এখন নিজের মত চাপিয়ে দেওয়া, মনের খায়েশমত নির্দেশ করা, দুনিয়ার প্রতি লোভ ও আমিত্ব ফলানোর পরিবেশ গড়ে উঠেছে। আর এই স্বার্থ উদ্ধারের জন্যেই এখন 'উমুমি বাইআত' বা গণহারে বাইআত করানোর কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। অথচ হযরতজি রহ. কর্তৃক গঠিত শুরা সর্বসম্মতিক্রমে বাইআত করতে নিষেধ করেছিলেন। সেই লিখিত সিদ্ধান্তের ওপর হযরতজির শুরার সদস্যদের স্বাক্ষরও রয়েছে।

অতীতের দু' হযরতের আমলে যেই নতুন নতুন উদ্ভাবিত বিষয়গুলো ছিলো না, এখন মাশওয়ারা ছাড়াই সেগুলো চালু করা হয়েছে।

এর একটি হল, দাওয়াত, তালীম ও ইসতিকবাল। নতুন এই পরিভাষা চালু করা হয়েছে। যা আমাদের আকাবির রহ. এর যুগে ছিলো না। যদিও ইদানিং এই পরিভাষার নাম পরিবর্তন করে 'তামীরে মসজিদ' নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু কাজ আগেরটাই। এই নতুন সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিদিন ঘরে ঘরে গিয়ে মেহনত করা ও উমুমি গাশত করার গুরুত্ব পুরোপুরি লোপ পেয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় হল, খাওয়াস ও অন্যান্য পদমর্যাদার লোকদের মাঝে মেহনত করা থেকে নিষেধ করা হচ্ছে। অথচ এ কাজ পূর্বের উভয় হযরতের যুগ থেকেই হয়ে আসছে। দেখা যেতো, পরবর্তীকালে খাওয়াস ও অন্যান্য পদমার্যাদার লোকজন উমুমি মেহনতের সঙ্গে জুড়ে যেতেন। এর উপকারিতা সূর্যালোকের চেয়েও স্পষ্ট। এই তবকাতি মেহনত বন্ধ করার জন্যে, 'তামীরে মাসজিদ' এর নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্যে শরিয়তের বিভিন্ন নস (نص) এর অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

তৃতীয় বিষয় হল, মুনতাখাব আহাদীস। মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. কখনো ইঙ্গিতেও এই কিতাব তালীম করার কথা বলেননি। এখন ধীরে ধীরে 'ফাযায়েল আমাল' উঠিয়ে দিয়ে তার স্থানে 'মুনতাখাব' চালু করার চেষ্টা চলছে।

চতুর্থ বিষয় হল, মাসতুরাতের পাঁচ কাজ। এভাবে প্রতিদিন নতুন নতুন ফেতনামূলক কথা ছড়িয়ে সাথীদের মানসিকতা নষ্ট করা হচ্ছে।

কেউ যদি এই বিষয়গুলোকে মানতে না চায়, কোনো এলাকায় যদি এ কাজগুলো চালু না হয় তখন বলা হচ্ছে, সেখানে নিযামুদ্দিনের তরতিব চলে না। অথচ এ কাজগুলো হচ্ছে, একক ব্যক্তি মৌলভি মুহাম্মদ সাদ সাল্লামাহুর একক সিদ্ধান্তে গৃহিত তরতিব।

এই নতুন পদক্ষেপগুলোর কবলে পড়ে নিযামুদ্দিন মারকাযের পূর্বের সবগুলো মজলিস ধ্বংস হয়ে গেছে। মারকাযের ওপর এমন একদল নতুন কর্মচারী দখল করে বসেছে, যারা আমাদের বড়দের সংশ্রবপ্রাপ্ত নয়। এরাই আগত লোকদের পেছনে লেগে যায় এবং তাদেরকে এ কথা বুঝানোর

চেষ্টা করে যে, 'প্রাদেশিক যিম্মাদারদের কথা শুনো না। কারণ তারা নিযামুদ্দিন মারকাযের তরতিব মানে না।' জামাতগুলোকেও এই হিদায়াত দিয়ে পাঠানো হচ্ছে যে, 'এই নতুন তরতিব অনুসারে জামাত পরিচালিত করবে।' এ কারণেই নিযামুদ্দিনে জামাত রওয়ানা হওয়ার পূর্ববর্তী হিদায়াতি বয়ান করার দায়িত্ব ও বিভিন্ন ইজতিমায় বয়ান করার দায়িত্ব এমন লোকদেরকেই দেওয়া হচ্ছে, যারা এই কথাগুলো বলবে।

এর ফলে এখন প্রতিটি প্রদেশে মতভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। জনে জনে মতভেদ হচ্ছে। নতুন সাথীরা মনে করছে যে, পুরনো লোকেরা নিযামুদ্দিনের কথা মানে না। আর পুরনো সাথীরা বিপাকে পড়ছে যে, এই নতুন নতুন বিষয়গুলো কীভাবে চালু হচ্ছে? এগুলো কখনই শুরার চূড়ান্তকৃত সিদ্ধান্ত নয়; বরং এগুলোর কারণে তাবলীগের মেহনত মূল বুনিয়াদ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে, কাজের রুখ বদলে যাচ্ছে। সব জায়গায় ইখতিলাফ, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য চলছে। আখেরাতের ফিকির, দ্বীনের দরদ, উম্মাহর জন্যে অন্তর্জ্বালা এবং নিজের ইসলাহ ও তরবিয়তের গুরুত্ব হারাতে বসেছে; অথচ এগুলোই ছিলো এই মেহনতের প্রাণ।

মৌলভি সাদ সাল্লামাহু এখন এমন একদল আমলার পরিবেষ্টনে আছে, যারা বড়দের সংস্পর্শ পায়নি। যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তার প্রতিটি কথার প্রশংসা করছে। তারা তাকে এই আত্মশ্লাঘার পাত্র বানিয়ে রেখেছে যে, 'আপনি এই মেহনত যতোটা গভীরভাবে বুঝতে পেরেছেন, পূর্ববর্তীরা ততোটা বোঝেনি এবং বর্তমান সময়ের সাথীদের মাঝেও তা বোঝার যোগ্যতা নেই।'

এই লোক যখন নিজের আবিস্কৃত নতুন বিষয়গুলো সম্পর্কে বয়ান করে তখন এ কথা বলে যে, 'আমি তোমাদেরকে কুরআন, হাদীস ও সীরাতের আলোকে বোঝাচ্ছি। এবং এই মেহনতটিকে কুরআন, হাদীস ও সীরাতের ওপর নিয়ে আসতে চাচ্ছি।' তার এ কথার অর্থ হলো, আমাদের আকাবির রহ. যেই কাজ করেছেন তা কুরআন, হাদীস ও সীরাত থেকে উদ্ভাবিত ছিলো না।

তিনি তার বয়ানের মাঝে অবলীলায় যে কারো ওপর আঙুল তুলছেন, সমালোচনা করছেন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছেন, শাসকসুলভ নির্দেশ করছেন, ইজতিহাদ করছেন, নতুন নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছেন। তার এই কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে আমাদের আকাবির রহ. এর মানহাজের পরিপন্থী। প্রতিদিন কোনো না কোনো ফেতনামূলক কথা ছেড়ে দিচ্ছেন। যার ফলে উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন পেরেশান ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ যে, এ-সব কী হচ্ছে? যদি এ গতিতেই ছুটতে থাকে তাহলে সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন উলামায়ে কেরাম আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবেন এবং উম্মাহর দূরদর্শী শ্রেণিও এই কাজ থেকে সরে পড়বেন।

কাজের গুরুত্ব ও এর মানহাজ হিফাযত করার জন্যে বিগত ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে দুনিয়ার সকল পুরনো সাথীদের উপস্থিতিতে হযরতজি রহ. এর শুরার সদস্যপদ পূরণ করা হয়েছিলো। সেই মজলিসে আমিও উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু তাজ্জব লাগলো, মৌলভি সাদ সাল্লামাহু সেই সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তার অস্বীকৃতির কোনো কারণ আমি দেখি না।

দুনিয়ার কোনো ধর্মীয়, শিক্ষামূলক বা জাতীয় প্রতিষ্ঠান, উম্মাহর কোনো সামাজিক কাজ শুরার পৃষ্ঠপোষকতা, তত্ত্বাবধান ও পথপ্রদর্শন ব্যতিরেকে চলতে পারে না। অতীতেও চলেনি, আগামীতেও চলবে না। উম্মাহর এতো বড় কাজ কোনো এক ব্যক্তির হাতে যদি তুলে দেওয়া হয় আর সেই এক ব্যক্তি যদি এই উঁচু কাজ নিজের মর্জি মুতাবেক চালাতে শুরু করেন তাহলে মারাত্মক ও ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটবে। কারণ, কোনো ব্যক্তি নিজের মানবসুলভ দুর্বলতা ও প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে নয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء

> 'আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ'। [সূরা ইউসুফ : ৫৩]

সম্ভবত এ বিষয়টি সামনে রেখেই মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. বলেছিলেন, 'আগামীতে এই মেহনত একটি শুরার তত্ত্বাবধানে চলবে।'

(দেখুন, আখিরী মাকতুব, মাকাতিবে মাওলানা ইলয়াস রহ.। লেখক, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.)

আমি উপর্যুক্ত কথাগুলো লিখেছি মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা ও হিসাব-নিকাশের ভয়ে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বড়দের পদ্ধতিতে কাজ করে যাওয়ার এবং নিত্য নতুন বিষয় অনুপ্রবেশ করানো থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দিন। আমীন।

ওয়াস-সালাম

বান্দা মুহাম্মদ ইয়াকুব
আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিন।
২৮ আগস্ট ২০১৬

তাবলিগের সাথী ভাইদের কাছে একান্ত অনুরোধ

প্রিয় ভাই ও আহবাব!

দাওয়াত ও তাবলীগের এই কাজ যেমন অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও বড় কাজ; এই কাজের ওপর আমাদের পরীক্ষাও তেমন বড় আকারে হাজির হয়েছে। পুরো দুনিয়াতে আমাদের গোটা ব্যবস্থাপনা নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। আজ দেশে-দেশে, জেলায়-জেলায়, শহরে-নগরে এমনকি পাড়া-মহল্লাতেও সাথীরা একে অন্যের প্রতিপক্ষ হয়ে দুটি সাংঘর্ষিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। গতকালও যারা একে অপরের ভাই-ভাই ছিলো; আজ তারা একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কাজের ফিকির উঠে গেছে। একজন অপরজনকে ভুল প্রমাণিত করার চেষ্টা করছে। আমাদের জীবন, সম্পদ ও সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বেদরকারি কাজে ব্যয় হচ্ছে। আমাদের শত্রুরা আমাদের মাঝে মতভিন্নতার যেই বীজ বপন করেছে, সেখানে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই। এই ইখতিলাফ নিরসন করা বড়দের কাজ। আল্লাহ তাআলার কাছে তাদেরকেই এই ইখতিলাফের জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই এই ইখতিলাফ নিরসনের দায়িত্বও তাদের।

আমরা যারা সাধারণ মানুষ– এই মুশকিল পরিস্থিতিতে আমাদের দায়িত্ব হলো, আমরা প্রত্যেকেই নিজেই নিজের কাছ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর নিবো যে, আমরা কি বুযুর্গদের বাতলানো পদ্ধতির ওপর আমাদের দিন-রাত অতিবাহিত করছি? যেই কমি ও শূন্যতা চোখে পড়বে, তার ওপর ইসতিগফার করব। আগামীতে আমাদের ব্যক্তিগত মামুলাত তথা নামায, যিকির, তিলাওয়াত ও দুআর ওপর গুরুত্ব বাড়িয়ে দেব। প্রাত্যহিক দু' তালীম, হাফতাওয়ারি মেহনত, দু-গাশত, মাসে তিন দিন, বছরে চিল্লা বা তিন চিল্লা– এই মেহনতগুলোকে নিজেরা যেমন নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে আমল করবো, অন্যদেরকেও এই মেহনতের জন্যে তৈরি করার সর্বাত্মক

চেষ্টা করব। অপধারণা, অপকথা বলা ও অর্থহীন কাজকর্ম থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখব। নিজের ভেতর উম্মতের জন্যে অস্থিরতা ও দরদ সৃষ্টি করব যে, তারা কীভাবে আমার কাজ না করার কারণে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বান্তকরণে দুআ-মুনাজাতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেব। আল্লাহ তাআলা আমাদের বড়দের মুজাহাদা ও অনুনয়-বিনয়ের ওপর বুনিয়াদ করে বাইরের বৈরী পরিবেশের বিপরীতে স্রেফ নিজের কুদরতের মাধ্যমে এই মেহনতকে সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, এই আমলের মাঝে অস্বাভাবিক প্রভাব ও কবুলিয়ত দান করেছিলেন। যদি আমরা সবাই এই কাজের সবগুলো চাহিদা পূরণ করে এই মেহনতের মাঝে নিজেকে নিয়োগ করি তাহলে আল্লাহ তাআলার সত্তার কাছে আশা করা যেতে পারে যে, তিনি নিজেই এ কাজের প্রভাব ও উপকারিতা পুনরায় পূর্বের মতো করে জারি করে দেবেন, ইনশাআল্লাহ।

চৌধুরি আমানত উল্লাহ

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অমীয় বাণী

যদি তুমি কারো মাঝে কোনো ক্রুটি সম্পর্কে অবহিত হও তাহলে তার সেই ক্রুটি নিয়ে আলোচনা করো না; বরং তার মাঝে কি কি ভালো রয়েছে, সেগুলো উল্লেখ করে তার আলোচনা করো।

তবে তার সেই ক্রুটি যদি দ্বীন সম্পর্কিত হয় অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির মাঝে দ্বীনি ক্রুটি পাও তাহলে তার সম্পর্কে অবশ্যই অন্যদের অবহিত করবে এ উদ্দেশ্যে যে, অন্যরা যেন তার অনুসরণ না করে এবং তাঁর থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখে।

দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া
[চয়িতাংশ]

আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি কথা তুলে ধরলাম। এর বাইরেও এমন অনেকগুলো কথা আমাদের কাছে পৌঁছেছে যেগুলো জমহুর উলামায়ে কেরামের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে একটি নতুন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির আলামত বহন করে। এগুলোর ভুল হওয়া এতোটাই পরিষ্কার যে, তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা এখানে অনুভব করছি না।

ইতোপূর্বে দারুল উলূম দেওবন্দের পক্ষ থেকে কয়েকবার চিঠি-পত্রের মাধ্যমে এবং দারুল উলূমে তাবলিগি ইজতিমার সময় 'বাংলেওয়ালি মসজিদ' এর প্রতিনিধিদলের সামনেও এর ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিলো; কিন্তু অদ্যাবধি সেই চিঠিগুলোর কোনো উত্তর হস্তগত হয়নি।

জামাআতে তাবলীগ একটি খালেস দ্বীনি জামাত। যদি এই জামাত জমহুর উম্মত ও আকাবির রহ. এর পথ-পদ্ধতি থেকে মতাদর্শিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সরে যায় তাহলে তা নিরাপদ থাকবে না। আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের শানে বেয়াদবি, মতাদর্শিক বিকৃতি, মনগড়া তাফসীর, হাদীস ও বর্ণনাসমূহের স্বেচ্ছাচারী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সঙ্গে হকপন্থী উলামায়ে কেরাম কখনই সম্মত হবেন না। এ বিষয়গুলো ঘটতে দেখলে তার ওপর মৌনতা অবলম্বন করা সমীচীন হবে না। কারণ, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে পুরো জামাতকে সীরাতে মুসতাকিম থেকে বিচ্যুত করবে। যেমনটি অতীতেও বিভিন্ন শুদ্ধিকামী ধর্মীয় সংগঠনগুলোর সঙ্গে ঘটেছে।

এ কারণে আমরা উপর্যুক্ত কথামালার আলোকে মুসলিম উম্মাহ, বিশেষত তাবলীগ সংশ্লিষ্ট বন্ধু-বান্ধবকে এ কথা সম্পর্কে সতর্ক করা নিজেদের ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করছি যে, মৌলভি মুহাম্মদ সাদ সাহেব তার জ্ঞানস্বল্পতার

কারণে নিজের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যার মাঝে জমহুর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন। যা নিঃসন্দেহে গুমরাহির রাস্তা। কাজেই তার সেই কাজগুলোর ওপর চুপ থাকা সমীচীন নয়। যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো নিরেট এক ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র; কিন্তু সেগুলো এখন জনগণের মাঝে ছড়াতে শুরু করেছে।

জামাআতে তাবলীগের মাঝে যেসকল ভাইয়ের প্রভাব রয়েছে, সেই ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতার অধিকারী, দূরদর্শী ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল ভাইদেরও আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আকাবির রহ. এর প্রতিষ্ঠিত এই জামাআতকে জমহুর উম্মত ও পূর্ববর্তী আকাবির যিম্মাদারদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করুন। মৌলভি মুহাম্মদ সাদ সাহেবের যেই ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা সাধারণ জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলো সংশোধন করার পূর্ণ চেষ্টা করুন। যদি এগুলোর ওপর তাৎক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তাহলে আশঙ্কা রয়েছে যে, আগামীতে তাবলীগ জামাআতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে উম্মাহর এমন একটি বৃহত্তর গোষ্ঠী গুমরাহির শিকার হয়ে বিভ্রান্ত ফেরকার রূপ ধারণ করতে পারে।

আমরা সবাই দুআ করছি যে, আল্লাহ তাআলা এই জামাআতকে নিরাপদ রাখুন এবং আকাবির রহ. এর পদ্ধতি অনুসারে ইখলাসের সঙ্গে তাবলীগি জামাআতকে 'জীবন্ত ও কর্মচঞ্চল' রাখুন, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিন। আমীন।

দারুল উলূম দেওবন্দের
আকাবির উলামায়ে কেরামের স্বাক্ষর

(পুরো ফতোয়াটি দারুল উলূম দেওবন্দের ওয়েবসাইটে দেখা যেতে পারে।)

চৌধুরি আমানত উল্লাহ
মোবাইল : 91-8826297141
ফোন : 011- 22029832
ই-মেইল : inam_ur_rehman2003@yahoo.com